নারীমুক্তি
সমতা ও ন্যায্যতা

নারীবাদী আন্দোলনের দাবীনামা

বা ং লা দে শ

নারীপক্ষ
জুন ২০১৯

দাবীনামা তৈরির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন দল

গীতা দাস, রীতা দাশ রায়, মাহীন সুলতান, শিরীন হক, ইউএম হাবিবুন নেসা এবং রীনা রায়, সদস্য নারীপক্ষ

সমন্বয়কারী

রীনা রায়

সম্পাদনা

বাংলা সংস্করণ

ইউএম হাবিবুন নেসা, রীনা রায় এবং মনীষা মজুমদার

ইংরেজী সংস্করণ

মাহীন সুলতান এবং শিরীন হক

সূ চী

মুখবন্ধ ৫

ভূমিকা ৭

ক. সুশাসন ১০

১. রাষ্ট্রকাঠামো ও সমাজব্যবস্থা ১০
প্রেক্ষাপট
আমাদের দাবী

২. নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আইন ১১
প্রেক্ষাপট
আমাদের দাবী

৩. মানবিক রাষ্ট্র ও নারী ১২
প্রেক্ষাপট
আমাদের দাবী

৪. নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব ১৩
প্রেক্ষাপট
আমাদের দাবী

খ. উন্নয়ন ও অগ্রগতি ১৫

৫. নারী উন্নয়ন নীতিমালা ও কর্মসুচী ১৫
প্রেক্ষাপট
আমাদের দাবী

৬. নারীমুক্তির অর্থনীতি ১৬
প্রেক্ষাপট
আমাদের দাবী

৭. কর্মক্ষেত্রে নারী ও নারীবান্ধব কর্মক্ষেত্র ১৭
প্রেক্ষাপট
আমাদের দাবী

৮. কৃষিতে নারী ১৮
প্রেক্ষাপট
আমাদের দাবী

৯. গৃহস্থালী কাজ ও কল্যাণমুখী সমাজ ২০
প্রেক্ষাপট
আমাদের দাবী

১০. নারীর নিরাপদ অভিবাসন ২১
প্রেক্ষাপট
আমাদের দাবী

১১. পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ২৩
প্রেক্ষাপট
আমাদের দাবী

গ. সমাজের চোখে নারী ২৪

১২. সংস্কৃতিতে নারী ২৪
প্রেক্ষাপট
আমাদের দাবী

১৩. প্রচার মাধ্যম ও নতুন প্রযুক্তি ২৫
প্রেক্ষাপট
আমাদের দাবী

১৪. উন্নয়নের মূলধারায় জেন্ডার সমতা অন্তর্ভুক্তি ২৬
প্রেক্ষাপট
আমাদের দাবী

ঘ. ব্যক্তি নারী ২৮

১৫. সহিংসতামুক্ত নারীর জীবন ২৮
প্রেক্ষাপট
আমাদের দাবী

১৬. নারীর স্বাস্থ্য, যৌন ও প্রজনন এবং অধিকার ৩০
প্রেক্ষাপট
আমাদের দাবী

১৭. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ৩২
প্রেক্ষাপট
আমাদের দাবী

১৮. বিশেষ অবস্থায় নারী ৩৩
প্রেক্ষাপট
আমাদের দাবী

১৯. দলিত ও হরিজন নারী ৩৪
প্রেক্ষাপট
আমাদের দাবী

২০. যৌনকর্মী ৩৬
প্রেক্ষাপট
আমাদের দাবী

২১. লিঙ্গ বৈচিত্র্য ও বিভিন্ন যৌন পরিচয়ের জনগোষ্ঠী ৩৬
প্রেক্ষাপট
আমাদের দাবী

২২. প্রতিবন্ধী নারী ৩৭
প্রেক্ষাপট
আমাদের দাবী

২৩. শান্তি ও নিরাপত্তা ৩৮
প্রেক্ষাপট
আমাদের দাবী

ঙ. নারী আন্দোলনের ভূমিকা ও করনীয় ৪০

মুখবন্ধ

নারীমুক্তির আকাঙ্ক্ষার এই দলিলটির নাম 'নারী আন্দোলনের চাওয়া-পাওয়া (দাবীনামা- চার্টার অব ডিমান্ড)'। বাংলাদেশ জন্মের পূর্ব থেকে নারী-অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে দেশীয়, উপমহাদেশীয় ও আন্তর্জাতিক ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় এই ভূখন্ডের নারীর ভূমিকা, অংশগ্রহণ ও অবদানের স্পষ্ট চিত্র এখানে তুলে ধরা হয়েছে। একইসাথে বর্তমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার নিরিখে নারীমুক্তির লক্ষ্যে করণীয় বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দাবি উত্থাপিত হয়েছে।

বাংলাদেশের ধর্ম-বর্ণ, শ্রেণি, গোষ্ঠী, ভাষা নির্বিশেষে সকল নারীর মুক্তি ও জীবনাকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রধানত

সুশাসন, রাষ্ট্রকাঠামো ও সমাজব্যবস্থা, নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আইন, মানবিক রাষ্ট্র ও নারী, রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব, উন্নয়ন ও অগ্রগতি, নারীমুক্তির অর্থনীতি, কর্মক্ষেত্রে নারী ও নারীবান্ধব কর্মক্ষেত্র, কৃষিতে নারী, গৃহস্থালী কাজ ও কল্যাণমুখী সমাজ, নারীর নিরাপদ অভিবাসন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, সমাজের চোখে নারী, সংস্কৃতিতে নারী, প্রচার মাধ্যম ও নতুন প্রযুক্তি, উন্নয়নের মূলধারায় জেন্ডারসমতা অন্তর্ভুক্তি, ব্যক্তি নারী, সহিংসতামুক্ত নারীর জীবন, নারীর স্বাস্থ্য এবং যৌন ও প্রজনন অধিকার, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, বিশেষ অবস্থায় নারী, দলিত ও হরিজন নারী, যৌনকর্মী, হিজড়া, বিভিন্ন যৌন পরিচয়ের মানুষ ও জেন্ডারভিত্তিক পরিচিতি, প্রতিবন্ধী নারী এবং নারী আন্দোলনের ভূমিকা ও করণীয় বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

শত বছরের নারী-আন্দোলন নারীর সত্যিকারের মুক্তিকে কতটুকু সফলতা দিতে পেরেছে তা প্রশ্নসাপেক্ষ। নানা চরাই-উৎরাইয়ে এই আন্দোলন কখনও অনেক বেগবান ছিলো, আবার কখনও কখনও বা কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে বা স্তিমিত হয়েছে কিন্তু আন্দোলন কখনও থেমে যায়নি। সময় ও বাস্তবতার ধারাবাহিকতায় পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে। তারই পথ ধরে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে নারী-আন্দোলন
জোরদার করার লক্ষ্যে পাকিস্তান ভিত্তিক বেসরকারি সংগঠন শিরকাত্ গাহ্- এর উদ্যোগে নারীপক্ষ'র নেতৃত্বে বাংলাদেশে নারী-অধিকার আন্দোলনে যুক্ত বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তির অংশগ্রহণে দাবিনামাটি তৈরি করা হয়।

‘নারী আন্দোলনের চাওয়া-পাওয়া’ দলিলটি ১২-১৩ অক্টোবর ২০১৮ অনুষ্ঠিত নারীপক্ষ আয়োজিত “অক্টোবর সম্মেলন” এবং ২০১৯- এর মার্চ ও এপ্রিল- এ অনুষ্ঠিত কর্মশালায় নারীপক্ষসহ ১৭৭টি সংগঠনের ৩৪৮ জন অংশগ্রহণকারীর সুপারিশ, বিভিন্ন সংগঠন থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত, ইত্যাদি আলোচনা-পর্যালোচনা সাপেক্ষে দাবিনামাটি বাংলা ও ইংরেজীতে প্রস্তুত করা হয়।

২০১৮ সালে নারীপক্ষ আয়োজিত জাতীয় সম্মেলন এবং ২০১৯ সালে মার্চ ও এপ্রিল এ অনুষ্ঠিত কর্মশালায় অংশগ্রহনকারী ১৭৭টি নারী ও মানবাধিকার সংস্থা, সংবাদ ও সাংস্কৃতিক কর্মী বাংলাদেশে ‘নারীবাদী আন্দোলনের দাবীনামা’ টি প্রস্তুত করে (সংযুক্তি-১) । এর মধ্যে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, বাংলাদেশ মহিলা আদিবাসী নেটওয়ার্ক, স্পার্ক, ওয়ারবি ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন,উইমেন উইথ ডিসএবিলিটিজ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (WDDF) এবং বাংলাদেশ ইনভায়রমেন্ট অ্যান্ড লিগ্যাল অ্যাসোসিয়েশন (বেলা) প্রতিবেদন তৈরিতে লিখিতভাবে অবদান রেখেছেন। প্রয়াত রাখী দাশ পুরকায়স্থ , সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এই প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন, আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে তার অবদানকে স্বরণ করছি। নারীপক্ষ সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সমন্বয়, বাংলা ও ইংরেজিতে প্রতিবেদন তৈরি এবং সম্পাদনা করেছে। নারীপক্ষ’র সদস্য ও কর্মীবৃন্দ যারা এই প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ভূ মি কা

নারীমুক্তির আন্দোলন সমাজ পরিবর্তন আন্দোলনের একটি অংশ। নারী প্রত্যেক গণতান্ত্রিক আন্দোলনসহ উপনিবেশ বিরোধী স্বাধীনতার আন্দোলন এবং ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনেঅবদান রেখেছেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৯ এর ছাত্র আন্দোলন এবং ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশে নারী-আন্দোলন সরাসরি রাজনৈতিক এবং সামাজিক আন্দোলনের ধারাবাহিকতার অংশ। এটি একটি বিশেষ নারীবাদী ঐতিহ্যকে ধারণ করে, যা রোকেয়া সাখাওয়াত হোসাইন এর লেখা এবং কর্মকান্ডে প্রকাশিত। তিনি এই উপমহাদেশে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের পথপ্রদর্শক। যেসকল নারী সম-অধিকার ও স্বাধীনতার জন্য বিপ্লব, লড়াই ও সংগ্রাম করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার অন্যতম। তাঁকে নির্ভীক এবং সাহসীকতার দৃষ্টান্ত হিসেবে মানা হয়।

অক্টোবর সম্মেলন ২০১৮, নারীপক্ষ

বাংলাদেশে চলমান নারী-আন্দোলন নিম্নোক্ত বিষয়সমূহকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে প্রতিরোধে ও প্রতিবাদে সংগঠিত হয়েছে:

- ✓ নারীর উপর সহিংসতা
- ✓ নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন
- ✓ সম-অধিকার।

নারীর গণ ও ব্যক্তিজীবনে সমতা এবং মুক্তির জন্য উপরোক্ত বিষয়সমূহ মুখ্য। সহিংসতা এবং সহিংসতার ভীতি বা আতঙ্ক নারীর জীবনে অন্যতম বিপত্তি, যা মারাত্মকভাবে নারীর শারীরিক ও মানসিক স্বাভাবিক বৃদ্ধি, চলাফেরার স্বাধীনতা এবং চিন্তা-চেতনার বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। নারীর শরীরকেন্দ্রিক চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গী নারীর উপর সহিংসতাকে নারীর সম্মান ও মর্যাদাহানি হিসেবে এতটাই গুরুত্ব দেয় যা গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে সুদৃঢ় করে এবং নারীকে হয় 'দেবী' নয় 'বেশ্যা' হিসেবে বিবেচনা করে। নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আইন, গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গী, সামাজিক বিধি-বিধান ও প্রথা এবং চর্চাকে আরো বৈধতা দেয়, সুদৃঢ় করে; তাই এই সমতার লড়াই শুধুমাত্র নারী-পুরুষের মধ্যে নয় বরং সম-অধিকারের। এই লড়াই সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং আইন ও নীতি সংস্কারের। নারীর অর্থনৈতিক অবস্থা নারীর স্বাধীনতা ও সমতাকে নির্ধারণ করে। অর্থনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ সমাজ এবং রাষ্ট্রে নারীর অবস্থা ও অবস্থান উন্নয়নের প্রধান উপায়।

এই বিষয়গুলোকে বিবেচনায় নিয়ে আমরা দেখবো, কিভাবে নারী-আন্দোলন জাতীয় ইতিহাসের সাথে যুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, নারীর উপর সহিংসতা (VAW) অথবা লিঙ্গবৈষম্য (GBV) এর জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও এর বিরুদ্ধে আন্দোলন হলো এ দেশের নারীসমাজের একটি লক্ষ্যণীয় কর্মকান্ড। বাংলাদেশ জন্মের ইতিহাসে আমরা দেখেছি যে, নারীর উপর সহিংসতা এবং সেই সহিংসতার নামকরণ ও স্বীকৃতি নিয়ে নানা ধরণের বিপত্তি রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশের মানুষের উপর যেধরনের নৃশংসতার বর্ণনা দলিলপত্রাদি ও বিভিন্ন লেখনীতে পাওয়া যায় তাতে নারীর উপর সহিংসতা প্রসঙ্গ ছিলো শুধুমাত্র তাদের উপর সংঘটিত ধর্ষণ। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ধর্ষণের শিকার নারীকে 'বীরাঙ্গনা' উপাধি দেয়া হয়। এই উপাধি পাওয়া সত্ত্বেও 'বীরাঙ্গনা'রা ছিলেন জনসম্মুখ থেকে অন্তরালে এবং সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত। অবশেষে ২০১৬ তে তাঁদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং তাঁরা 'মুক্তিযোদ্ধাভাতা' পেতে শুরু করেন। উল্লেখ্য, বীরঙ্গনাদের দাবির প্রেক্ষিতে তাঁদের নারী-মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। 'বীরাঙ্গনা' উপাধি তাঁদের ও তাঁদের পরিবারের জন্য লজ্জা এবং অসম্মানের কারণ ছিল। ইজ্জত-সম্মান বিষয়টি সমাজে সাধারণভাবে নারীর শরীর ও পরিচয়ের সাথে ওতোপ্রোতোভাবে যুক্ত। 'বীরাঙ্গনা' একটি সম্মানজনক উপাধি কিন্তু যারা ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তাদের জন্য এই উপাধি সম্মান হারানোর কারণ হয়েছে। বীরাঙ্গনারা যুদ্ধের বীর হিসেবে আখ্যায়িত কিন্তু তাঁদের উপর সংঘটিত নৃশংস অপরাধ একেবারেই অপ্রকাশিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে (১৯৭২) রাষ্ট্রে নারীর অবস্থানের বর্ণনা অস্পষ্ট। সংবিধানের প্রারম্ভে 'সকল নাগরিকের সমতা'র বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে কিন্তু ২৮-২ অনুচ্ছেদের সাথে তা সাংঘর্ষিক। এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্র এবং গণজীবনের প্রত্যেক পর্যায়ে নারী পুরুষের ন্যায় সম-অধিকার পাবে"। এটি নাগরিকদের মধ্যে লিঙ্গের ভিত্তিতে বৈষম্য করার সুযোগ তৈরি করে, যা পারিবারিক এবং ব্যক্তিজীবনে আইনের মাধ্যমে বৈষম্য করা হয়, যেমন: বিয়ে, বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার

ইত্যাদি পরিচালিত হয় ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ (BMP) অনেকগুলো আইন সংশোধনের সাথে যুক্ত ছিলো, যেমন: যৌতুকবিরোধী আইন বা বিবাহ নিবন্ধন আইন । ১৯৮০ দশকের শেষের দিকে সকল ধর্ম ও বিশ্বাসের নারীর সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি অভিন্ন পারিবারিক আইনের দাবি ওঠে। সংবিধান ব্যক্তিজীবনের অধিকারকে উহ্য রেখে নারী-পুরুষের ব্যক্তিজীবন এবং গণজীবনের মধ্যে বিভাজন তৈরি করেছে, যা নারীর জীবনে সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক পরিণতি এনেছে।

তৃতীয় সমস্যাটি দেখা যায় বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সময়ে, যা হলো উন্নয়নের প্রশ্ন; যেখানে নারী উন্নয়ন বেশীরভাগ সময়ে জাতীয় উন্নয়নের নির্দেশক। জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালকে নারীবর্ষ এবং ১৯৭৫-১৯৮৫ সালকে নারী উন্নয়ন দশক হিসেবে ঘোষণা করে। বাংলাদেশ আগে থেকেই উন্নয়নের আলোচনার অংশ ছিলো। অনেক এনজিও তাদের কর্মসূচিতে নারী উন্নয়নের কাজে নারীদের কর্মী হিসেবে নিতে আগ্রহী ছিলো। সামাজিক পরিবর্তন এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে নারীকে অভিষ্ট জনগোষ্ঠী ও প্রতিনিধি হিসেবে পরিকল্পনার আওতাভুক্ত করা হয়েছিল। নারী-উন্নয়নকর্মী বাংলাদেশের নারীর দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে সহযোগিতা করেছে। উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা কাজ করেছে, যেমন: পরিবারপরিকল্পনা, ক্ষুদ্র ঋণ বা আয় বৃদ্ধিমূলক কাজ। কিন্তু এই কর্মসূচীসমুহ নারীর অবস্থান পরিবর্তনে ইতিবাচক ভুমিকা রাখে নাই।

বাংলাদেশের নারী-আন্দোলন প্রতিবাদ কর্মসূচি, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও লেখনী, ইত্যাদি সৃজনশীল উপায়ে নারী-পুরুষের সম-অধিকারের দাবি তুলেছে। বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে অন্যান্য মানবাধিকার সংগঠন এবং প্রগতিশীল গোষ্ঠীর সঙ্গে জোট গঠন করেছে এবং জনসম্মুখে সরব উপস্থিতির চেষ্টা করেছে। নতুন কর্মকৌশল সক্রিয় রাখার জন্য সংগঠনসমূহ আন্দোলনের প্রত্যেক ধাপে যুক্ত থেকেছে ।

নারী আন্দোলনে এখন সম্ভবত সবথেকে অন্যরকম মুহূর্ত, যেখানে রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তন ঘটছে। সুতরাং আমাদের নতুন মৈত্রীবন্ধন এবং নতুন উপায়ে আন্দোলন সক্রিয় করার চিন্তা করতে হবে। বাংলাদেশের নারী-আন্দোলন শক্তিশালীকরণ, নারীর মানবাধিকার, সমমর্যাদা এবং ক্ষমতায়নের জন্য আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনের সাথে বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের সংযোগ প্রতিষ্ঠা গুরুত্বর্পূণ।

দাবীনামা তৈরির কর্মশালা ২০১৯

ক. সুশাসন

১. রাষ্ট্রকাঠামো ও সমাজব্যবস্থা

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ রাষ্ট্রকাঠামোর মূল তিনটি স্তম্ভ, (১) আইন সভা (২) বিচার বিভাগ (৩) নির্বাহী বিভাগ- রাষ্ট্র পরিচালনায় এই তিন স্তম্ভের স্বাধীনতা, স্বকীয়তা ও স্বতন্ত্রতা নিশ্চিত করে সুশাসন। জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, আইনের শাসন, জনগণের অংশগ্রহণ, সম্পদের ন্যায্য ও সমতাভিত্তিক বন্টনব্যবস্থা সুশাসনকে আরও সুদৃঢ় করে। স্থানীয় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সুশাসনের ঘাটতি সবসময়ই বিরাজমান; ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্যনিরাপত্তাসহ ভোটাধিকার, বাকস্বাধীনতা, সংগঠিত হওয়ার স্বাধীনতা, ইত্যাদি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই জনগণ অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। সুশাসনের ঘাটতির কারণে সমাজে ও ব্যক্তিপর্যায়ে জবাবদিহিতার অভাব তৈরি হচ্ছে। নারীর ক্ষেত্রে বিষয়টি আরও প্রকট যা প্রায়শঃ স্বেচ্ছাচারী ও বিদ্বেষমূলক। বিচারহীনতার সংস্কৃতি সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে, এর ফলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে নারী। বিচারহীনতার মূল কারণ দুর্নীতি এবং জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতার অভাব; যার বিস্তৃতি রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে, বিভাগে ও স্তরে।

দুর্নীতির আগ্রাসনে দেশের প্রতিটি নাগরিক ক্ষতিগ্রস্থ; নারী ও পিছিয়ে পড়া মানুষ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ। ২০২২ সালের Transparency International-এর Perspective Index অনুযায়ী ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের স্থান ১৪৭। এই প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশের স্থানীয় থেকে জাতীয় পর্যন্ত সকল প্রতিষ্ঠান দুর্নীতির আগ্রাসনে আক্রান্ত।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রধান উপায় হচ্ছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ। এর মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব প্রতিটি সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তরিত হয়; স্থানীয় সরকার-ব্যবস্থাও শক্তিশালী এবং সক্রিয় হয়।

বাংলাদেশের সংবিধানে শুরু থেকেই বিকেন্দ্রীকরণের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকলেও আজ পর্যন্ত এই বিধানকে কার্যকর করা হয়নি, ফলে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নাগরিকের সক্রিয় অংশগ্রহণ বাধাগ্রস্থ ও সীমিত।

আমাদের দাবি

- রাষ্ট্র পরিচালনায় সংবিধানে প্রদত্ত অঙ্গীকারসমূহ দ্রুত ও কার্যকর বাস্তবায়ন করা
- জনগণ তথা নারীর অধিকার খর্ব ও সীমিত করে এমন বিধানসমূহ সংবিধান থেকে বিলুপ্ত করা
- সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি নির্মূলে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করা এবং প্রভাবমুক্ত রাখা
- আইনসভার দায়িত্ব আইন প্রণয়ণ এবং আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন নজরদারীর মধ্যেই সীমিত রাখা
- স্থানীয় ও জাতীয় সরকারের কর্মপরিধি, দায়িত্ব ও ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রেখে বন্টন ও সমন্বয় নিশ্চিত করা।

২. নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আইন

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ সংবিধান সকল নাগরিককে আইনের দৃষ্টিতে সমান, আইনের সমান আশ্রয় লাভ এবং নাগরিকের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন না করার নিশ্চয়তা দিয়েছে কিন্তু এর বাস্তবায়ন হচ্ছে না। তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীর বিষয়টি সংবিধানে অনুপস্থিত। রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার সংবিধানে স্বীকৃত, তবে ব্যক্তিজীবনে নারী-পুরুষের মধ্যে অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে বৈষম্য রয়েছে। নারী, শিশু এবং সকল অনগ্রসর নাগরিকের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন করতে বলা হয়েছে, তথাপি আজ অবধি বৈষম্যমূলক আইনের বিলুপ্তি এবং নাগরিকের ব্যক্তিজীবনে সমান অধিকার এখনো নিশ্চিত নয়। উত্তরাধিকার, বিয়ে, তালাক, অভিভাবকত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রে সম-অধিকার নেই, যেমন: মা কখনোই সন্তানের স্বাভাবিক অভিভাবক নন, জিম্মাদার মাত্র; অর্থাৎ অভিভাবকত্ব পুরুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

আমাদের দাবি

- সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৬ অনুযায়ী বৈষম্যমূলক আইনের বিলুপ্তি এবং রাষ্ট্র, গণ ও ব্যক্তিজীবনে প্রতিটি নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত করা
- বিয়ে, তালাক, উত্তরাধিকার, অভিভাবকত্ব ইত্যাদি বিষয়ে প্রচলিত সকল বৈষম্যমূলক আইন বাতিল করা এবং ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, জন্মস্থান নির্বিশেষে সম-অধিকার ও মর্যাদার ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করা
- নারীকে অধস্তন অবস্থানে ধরে রাখার সকল প্রথা, চর্চা এবং রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান বিলুপ্ত করা
- সরকারের অঙ্গীকারকৃত আন্তর্জাতিক সনদ ও দলিলসমূহের আলোকে নারীকে সমমর্যাদার নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা
- জাতি, ধর্ম, বর্ণ এবং শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধী, লিঙ্গ, জন্মস্থান, ভাষা নির্বিশেষে সকলের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা করা
- পরিবার, সমাজ, কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সকলক্ষেত্রে নারী এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে সম-অধিকার নিশ্চিত করা।

৩. মানবিক রাষ্ট্র ও নারী

প্রেক্ষাপট

যে রাষ্ট্র সকল নাগরিকের জান ও মালের নিরাপত্তা এবং সকল অধিকার নিশ্চিত করবে; শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখবে; মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি বিকাশের সুযোগ দেবে; সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা স্থিতিশীল রাখবে; আইনের শাসন বজায় রাখবে; নারী, পুরুষ, তৃতীয়লিঙ্গ, ধর্ম, নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়, গোষ্ঠী, শ্রেণি, যৌন পরিচিতি নির্বিশেষে সকল নাগরিককে সমান চোখে দেখবে সেই রাষ্ট্রকে মানবিক রাষ্ট্র বলা যায়। রাষ্ট্রের কোন ধর্মপরিচয় থাকবে না বা রাষ্ট্র কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি আনুগত্য ও পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করবে না।

১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ সংবিধানে অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে অন্যান্য ধর্মের নাগরিককে অধঃস্তন করা হয়েছে, যা মানবিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী। মানবিক রাষ্ট্র হবে ইহজাগতিক। এই রাষ্ট্রের সমাজ হবে ধর্মনিরপেক্ষ এবং নাগরিক হবে অসাম্প্রদায়িক, অর্থাৎ রাষ্ট্রের কোন ধর্ম থাকবে না। সমাজ হবে ধর্মনিরপেক্ষ, কারণ সমাজে বিদ্যমান ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শ ও ধর্মীয় বিশ্বাসের অবস্থান থাকবে। ধর্ম ব্যক্তিগত বিষয়। ধর্ম চর্চা করতে গিয়ে সাম্প্রদায়িক হওয়া যাবে না। ন্যায্যতা ও সমতা প্রতিষ্ঠায় ধর্মনিরপেক্ষতা অপরিহার্য্য। সকল ধর্মের বিধিবিধানের সাথে নারীর সম-অধিকারের বিষয়টি সাংঘর্ষিক, তাই ধর্ম যখন রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে স্থাপিত হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই নারী-অধিকার ক্ষুণ্ন হয়; বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশের সংবিধান সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার সমানভাবে ভোগের নিশ্চয়তা দিয়েছে কিন্তু সেই সংবিধানই আবার ব্যক্তি-অধিকারের বিষয়টি উহ্য রেখে সম-অধিকারের প্রশ্নে সংবিধানকে সাংঘর্ষিক অবস্থায় ফেলে দিয়েছে।

সংবিধানের ৩৬ অনুচ্ছেদ রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকের অবাধ চলাফেরার নিশ্চয়তা দিলেও নারীর চলাফেরার স্বাধীনতা প্রথা ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে বাধাগ্রস্ত এবং অনিরাপদ। সংস্কৃতির লালন-পালন ও বিকাশে নারী মুখ্য ভূমিকা পালন করলেও ধর্মের নামে নারীকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। নারীকে অধঃস্তন অবস্থানে রাখতে সংস্কৃতি, প্রথা ও ধর্ম মুখ্য ভূমিকা রেখে চলেছে এবং এই অবস্থা টিকিয়ে রাখছে রাষ্ট্র; অর্থাৎ সার্বিক বিবেচনায় নারীর অধঃস্তন অবস্থানের জন্য দায়ী রাষ্ট্র।

মানবিক রাষ্ট্রের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নাগরিকের জীবন রক্ষা করা কিন্তু রাষ্ট্র অপরাধ দমনের নামে মৃত্যুদন্ড বহাল রেখেছে এবং সন্ত্রাস দমনের বাহানায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে বিচারবহির্ভূত হত্যার ঘটনা ঘটছে। 'মৃত্যুদন্ড' মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের মূলনীতি "বেঁচে থাকার অধিকার"-এর সাথে সাংঘর্ষিক। অতএব, মানবিক রাষ্ট্র গঠনে বিচারিক ব্যবস্থায় মৃত্যুদন্ড ও বিচার বর্হিভূত হত্যা বন্ধ করতে হবে।

আমাদের দাবি

- অনুমোদিত আন্তর্জাতিক সনদ ও দলিলসমূহ বাস্তবায়ন করে নারীকে সমমর্যাদার নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা
- সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী বাতিল করে রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে পৃথক করা

- ভিন্ন মত, ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রতি সহনশীলতার সংস্কৃতি নির্মাণ ও বিকাশের লক্ষ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ভাষা, সংস্কৃতি ও অন্যান্য গণমাধ্যমে ইহজাগতিক রাষ্ট্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজ এবং বাক-স্বাধীনতার বিষয়গুলি গুরুত্বসহকারে আলোচনা ও প্রচার করা
- ইহজাগতিক রাষ্ট্র, ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ ও অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তির বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গী বিনির্মানে বিষয়টি পাঠ্য পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা।

৪. নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব

প্রেক্ষাপট

বিভিন্ন বৈষম্যমূলক সামাজিক আচরণ, আইন-কানুন ও রাষ্ট্রীয় রীতি-নীতি ইত্যাদির কারণে নারী পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে পুরুষের উপর নির্ভরশীল।

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন এমন এক সক্ষমতা এবং অর্জন যার ফলে সে স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে নাগরিক অধিকারের স্বীকৃতি পায় এবং তা চর্চা করতে পারে; স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ ও চলাফেরা, রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ, উত্তরাধিকারের উপর নারীর সমান অধিকার (সম্পদ আহরণ, অর্জন ও নিয়ন্ত্রণ), রাজনৈতিক দলে অন্তর্ভুক্তি, স্বাধীনভাবে ভোট প্রদান, প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নীতিনির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো ইউনিয়ন পরিষদ থেকে জাতীয় সংসদ পর্যন্ত বিস্তৃত। স্থানীয় সরকারে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে সংরক্ষিত আসনে বর্তমানে সরাসরি নির্বাচন হয় কিন্তু জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে দলীয়ভাবে মনোনীত হয়। জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনের মনোনয়নের পদ্ধতি নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পরিপন্থি। ক্ষমতাকাঠামোর প্রতিটি স্তরে সম-অংশগ্রহণ ও গণতান্ত্রিক চর্চার মাধমে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব সীমিত। এছাড়াও রাজনৈতিক অঙ্গন কালো টাকা ও পেশীশক্তির নিয়ন্ত্রণে থাকায় নারী অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। রাজনৈতিক দল, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়নসহ সকল প্রতিষ্ঠানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্বের সুযোগ এবং সক্ষমতার অভাব।

আমাদের দাবি

- রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে নারীর অংশগ্রহণের অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য নিবন্ধিত সকল দলের প্রতিটি স্তরের কমিটিতে এক-তৃতীয়াংশ নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা
- নারীনেতৃত্বের বিকাশ, বিস্তৃতি, বিকল্প নেতৃত্ব তৈরি এবং স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর কার্যকর ও সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
- নারীর অবস্থা ও অবস্থান উন্নয়নের জন্য সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে প্রতিটি পর্যায়ে নারীকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পৃক্ত করা

- স্থানীয় সরকার কমিটি, বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কমিটি ও সংসদে প্রতিনিধিত্বসহ প্রশাসন ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার সকল পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
- জাতীয় জীবনের সর্বত্র নারীর অংশগ্রহণের লক্ষ্যে যার যার নিজস্ব অবস্থান থেকে পদক্ষেপ গ্রহণ করা
- জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন, আসন সংখ্যা এক তৃতীয়াংশে বৃদ্ধি এবং নির্বাচনী এলাকা পুনঃনির্ধারণ করা
- রাজনীতিতে কালো টাকা, পেশীশক্তি ও দুর্নীতি নির্মূল করা
- ব্যালট পেপারে 'না' ভোট প্রদানের সুযোগ রাখা
- জাতীয় সংসদের বর্তমান সংরক্ষিত আসনে মনোনীত সদস্যদের জন্য দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা
- নির্বাচন কমিশন কর্তৃক গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ২০০৯ ও ৯০ (সি) অনুযায়ী প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের সকল পর্যায়ে ২০২৫ সালের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ নারী অন্তর্ভুক্ত করা।

খ. উন্নয়ন ও অগ্রগতি

৫. নারী উন্নয়ন নীতিমালা ও কর্মসুচী

প্রেক্ষাপট

নারীর ক্ষমতায়ন, সম-অধিকার ও সমসুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় নারী-উন্নয়ন নীতি প্রণীত হয়। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়, সংস্থা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে বাংলাদেশ সংবিধান, আন্তর্জাতিক সনদ- যথা: নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও), শিশু অধিকার সনদ (সিআরসি), বেইজিং ঘোষণা ও কর্ম পরিকল্পনার আলোকে জাতীয় নারীউন্নয়ন নীতি প্রণীত হয়।

১২ টি বিষয়ের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে রাষ্ট্রীয় ও গণজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। অন্যান্য বিষয়সমূহের মধ্যে রয়েছে: নারীর নিরাপত্তা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূলধারায় নারীর পূর্ণ ও সম-অংশগ্রহণ ,দারিদ্র দূরীকরণ, নারীর অবদানের স্বীকৃতি প্রদান এবং সকল প্রকার বৈষম্য দূর করা, নারীর স্বার্থের অনুকূল প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও আমদানী করা এবং নারীর স্বার্থ বিরোধী প্রযুক্তির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা, নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ নিশ্চিত করা ও নারী উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়ক সেবা প্রদান করা।

নারী ও মেয়েশিশুর মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ, সকল প্রকার সহিংসতা দূরীকরণ, সশস্ত্র সংঘর্ষ ও সুরক্ষা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি, জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকান্ডে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সম-অধিকার নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র দূরীকরণ, নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থান, জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট এবং জেন্ডার বিভাজিত তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বিষয়কে নারী উন্নয়ন নীতিমালায় অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

নারী উন্নয়ন নীতিমালায় নারী ও প্রযুক্তি, নারীর খাদ্য নিরাপত্তা, জাতীয় অর্থনীতিতে নারী কৃষিশ্রমিকের স্বীকৃতি প্রদান, নারীর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার উচ্চ পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী নিয়োগ গুরুত্ব পেয়েছে। দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও পরবর্তী সময়ে নারী ও শিশুর সুরক্ষা, প্রতিবন্ধী, অনগ্রসর ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নারীর জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণও গুরুত্ব পেয়েছে। এছাড়াও, সহিংসতার শিকার নারীর অধিকার, চাহিদা ও বিশেষ

প্রয়োজন প্রচারের জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়ার লক্ষ্যে গণমাধ্যমের ভূমিকা নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

আমাদের দাবি

- নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আইন, নীতিমালা, কর্মসূচি বাতিল করা
- অনুমোদিত আন্তর্জাতিক দলিল ও আইনের আলোকে নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক আইন, নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা
- নারী উন্নয়ন নীতিমালা পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করা

৬. নারীমুক্তির অর্থনীতি

প্রেক্ষাপট

'নারীমুক্তির অর্থনীতি' বুঝতে হলে গবেষণা করে জানা প্রয়োজন যে, ম্যাক্রো অর্থনৈতিক নীতিমালা ও কাঠামো নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য বজায় রাখতে কি ধরনের ভূমিকা রাখে এবং কিভাবে জেন্ডারবৈষম্য দূর করে একটি ন্যায্য ও টেকসই সমাজ তৈরি করা যায়। বর্তমান পরিস্থিতি এবং জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামো ও প্রক্রিয়াসমূহ নারীর অবদান, সম্ভাবনা ও চাহিদাকে পুরুষের সমান গুরুত্ব দেয় না। নারীমুক্তির অর্থনীতির উদাহরণ ও গবেষণা উভয়ই নারী এবং পুরুষের প্রাত্যহিক জীবন ও বিভিন্ন চাহিদা, জীবনযাপনের বিভিন্ন অনুষঙ্গসমূহকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে, যা একটি কল্যাণমূলক সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখে- যেখানে যৌন ও প্রজনন অধিকার এবং সেবামূলক কর্মকান্ড অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচিত হয়।

বিভিন্ন দেশে দরিদ্রতার ভিন্ন ভিন্ন রূপ রয়েছে এবং নারী-পুরুষের মধ্যেও ভিন্নতা রয়েছে। সবক্ষেত্রেই দারিদ্র্যের হিসাব-নিকাশে নারীই অধিক মাত্রায় দৃশ্যমান।

নারীমুক্তির অর্থনীতি নারীর অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও সম্ভাবনাসমূহ পুরুষের মতো সমভাবে বিকশিত হবার সুযোগ পাবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সফলতার সূচক যা নারী-পুরুষ উভয় কর্তৃক অগ্রাধিকারভিত্তিতে মূল্যায়িত হবে। মানুষের কর্মজীবনের মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত হবে।

আমাদের দাবি

- জেন্ডারসমতা অর্জনের লক্ষ্যে জেন্ডারসমতার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সরকার কর্তৃক বাজেট তৈরি ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে এর বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করা
- অর্থনৈতিক নীতিসমূহ জেন্ডার সংবেদনশীল করার জন্য নারীবাদী অর্থনীতি বিশ্লেষণের দক্ষতা তৈরি করা
- আর্থসামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারীর অবৈতনিক সেবামূলক কাজ দৃশ্যমান করা, যা ইতিমধ্যে

অর্থনৈতিক মডেলে প্রতিফলিত হয়েছে, তা বিবেচনায় নেয়া

- নারী-পুরুষের মধ্যে বিরাজমান অসমতা ও বৈষম্যসমূহকে চিহ্নিত করা এবং নিরসনে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা
- ম্যাক্রো অর্থনীতিতে ব্যবসা ও বাৎসরিক অর্থ-পরিকল্পনায় জেন্ডার বিশ্লেষণ এবং নারী-পুরুষের উপর এর প্রভাব অন্তর্ভুক্ত করা

৭. কর্মক্ষেত্রে নারী ও নারীবান্ধব কর্মক্ষেত্র

প্রেক্ষাপট

অর্থনীতিতে নারীর অবদান এবং এর মাত্রা ও প্রকৃতি সাধারণত স্বীকৃত অথবা মূল্যায়িত নয়, যদিও নারী ঘরে এবং বাইরে- উভয় ক্ষেত্রেই উৎপাদনমূলক ও উপার্জনমুখী কর্মকান্ড এবং বাজারকেন্দ্রিক উৎপাদনকারী ও উদ্যোক্তা হিসেবে যুক্ত থাকে। এছাড়াও, নারী অবৈতনিক গৃহস্থালী (রান্না করা, সন্তান পালন করা, বয়স্কসেবা প্রদান, আঙ্গিনায় সব্জী বাগান করা, হাঁস-মুরগী ও গবাদী পশু পালন, ইত্যাদি) দায়িত্ব পালন করে।

বাংলাদেশে শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে। ২০২২ সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর একটি জরিপ অনুসারে, পাঁচ বছরে নারী শ্রমিকের হার ৩৬.৩% থেকে ৪২.৬৮% বেড়েছে। বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস অতিমারী দ্বারা সৃষ্ট কৃষি খাতে নারীদের ক্রমবর্ধমান সম্পৃক্ততা এবং নগর-গ্রামীণ অভিবাসনের কারণে বাংলাদেশে গ্রামীণ নারী শ্রমিকের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি হয়। ২০১৬ সালে, গ্রামীণ নারীর অংশগ্রহণের হার ছিল ৩৮.৬ শতাংশ। বিবিএস সমীক্ষার সর্বশেষ সংস্করণ অনুসারে ২০২২ সালে এই হার ৫০.৮৯ শতাংশ বেড়েছে যা ২০২৩ সালে প্রকাশিত হয়েছে। এর একটি কারণ হতে পারে সাম্প্রতিক সময়ে কৃষি বহির্ভূত কার্যক্রম বৃদ্ধি। অতিমারীর কারণে পোশাক কারখানা বন্ধ হওয়াসহ অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে ব্যাপক কর্মী ছাঁটাই যেখানে বেশিরভাগই নারী শ্রমিক। ধারণা করা যায় এর কারণেও গ্রামীণ নারী শ্রমশক্তির বৃদ্ধি হতে পারে। মূলত স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম ২০২১ অনুযায়ী শহরাঞ্চল থেকে গ্রামীণ অঞ্চল এবং অন্যান্য শহরে স্থানান্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

একই সময়ে, শহরাঞ্চলে নারী শ্রমিকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যহারে হ্রাস পায় যা ২০১৬-২০১৭ সালে ৩১% এবং ২০২২ সালে ২৩.৬%। গ্রামাঞ্চলে নারীর পারিবারিক অর্থনৈতিক কার্যক্রমে যোগদান করা অনেকটা সহজ। অর্থনীতিবিদদের মতে, গ্রামীণ এবং সামগ্রিকভাবে নারীর শ্রমশক্তির পরিসংখ্যানগত বৃদ্ধি ইতিবাচক নাও হতে পারে কারণ মানসম্পন্ন কাজে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত। গ্রামাঞ্চলে নারী শ্রমশক্তির বেশিরভাগই মজুরিসহ কাজের পরিবর্তে আত্ম-কর্মসংস্থানের সাথে যুক্ত। শহরাঞ্চলে নারী শ্রমশক্তির হার কমে যাওয়া ইতিবাচক নয়, কারণ শিক্ষিত নারীর আকাঙ্খা অনুযায়ী মানসম্পন্ন কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত, ফলে শিক্ষিত নারীর বেকারত্বের হার অনেক বেশি দৃশ্যমান হতে পারে।

ঘরে-বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই বেতনসহ কর্মসংস্থানের সুযোগ পুরুষের তুলনায় নারীর সব সময় কম। আনুষ্ঠানিক শ্রমক্ষেত্রে অংশগ্রহণে কাজের পরিবেশ, মজুরি, পদোন্নতি ও পেনশন সুবিধা, ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ভিন্নতা রয়েছে। পুরুষের তুলনায় খুব কম সংখ্যক নারী সুযোগ-সুবিধাসহ কর্মসংস্থানের সুযোগ পায় এবং

একটি বড় সংখ্যক নারী অনানুষ্ঠানিক খাতে অথবা গৃহশ্রমিক হিসেবে যুক্ত। তাদের মজুরি অত্যন্ত কম, কর্মপরিবেশ নিম্নমানের, অনিরাপদ এবং অনিশ্চিত।

আমাদের দাবি

- নারীর সমকাজে সমমজুরীসহ সকল সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা
- আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক উভয় কর্মক্ষেত্রের জন্যে ন্যূনতম মজুরি কাঠামো তৈরি করা
- শ্রম আইনের আলোকে সরকার, নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান ও ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক নারীর জন্য সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা
- সন্তান লালন-পালনে পিতা-মাতা উভয়ের দায়িত্ব ও অংশগ্রহণ সরকারিভাবে নিশ্চিত করা ও এর মান উন্নত করা । সরকারি বা সরকারি সহযোগিতায় দিবা শিশুযত্ন এবং বয়স্ক সেবা-যত্ন কেন্দ্রের মান উন্নয়ন করা এবং পরিবীক্ষণের আওতায় আনা
- সরকার ও নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, নিরাপদ যানবাহন ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা
- কর্মক্ষেত্রে সকল প্রকার যৌন হয়রানি ও সহিংসতা নিরসনে ২০০৯ সালে উচ্চ আদালতের নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নে সকল প্রতিষ্ঠানকে বাধ্য করা এবং সরকার ও ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক পরিবীক্ষণ ও এর আলোকে আইন প্রণয়ণ করা
- জনপরিসরে এবং কর্মক্ষেত্রে যাতায়াতে নারীর নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ, স্থানীয় সরকার এবং নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান/সমিতিসমূহের অগ্রণী ভূমিকা নিশ্চিত করা
- অনানুষ্ঠানিক খাতে যেখানে নারীর অংশগ্রহণ বেশি- যেমন: গৃহকর্মী, কৃষিশ্রমিক, ফুটপাতব্যবসায়ী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ক্রমান্বয়ে শ্রম-আইন এর আওতায় এনে ন্যূনতম মজুরী ও অন্যান্য অধিকার নিশ্চিত করা
- মাতৃত্বকালীন ও পিতৃত্বকালীন ছুটিসহ সমস্ত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা
- আর্থিক এবং যৌন নিরাপত্তাহীনতা দূর করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা
- নারীকে অ-প্রথাগত, উচ্চ উৎপাদনমুখী ও উচ্চ পেশায় যুক্ত হবার জন্য উৎসাহিত করা এবং এই কাজে দক্ষতা বৃদ্ধি ও সহায়তা করা।

৮. কৃষিতে নারী

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদন্ড কৃষি। এই খাতে প্রবৃদ্ধি অর্জন ছাড়া গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচন, বেকারত্ব দূর এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্যের যোগান দিতে অতীতকাল থেকে নারী বাড়িতে ও মাঠে সমানভাবে কৃষিকাজে যুক্ত অথচ দেশের অর্থনীতিতে নারীর এই

অবদান স্বীকৃত নয়। অন্যান্য অনানুষ্ঠানিক খাতের মতোই কৃষিখাতে নিয়োজিত নারীশ্রমিকও বেতনবৈষম্যসহ নানা বৈষম্যের শিকার হয়।

বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ২০১১ সালের তথ্য অনুযায়ী ৭০% নারী সরাসরি কৃষি বিপনন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত, ৮০% নারী খাদ্য উৎপাদন , ১০% নারী খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং ৬০-৯০% নারী গ্রামীন বিপননের সাথে যুক্ত।

দক্ষিন এশিয়ার ৩৯% নারী কৃষিশ্রমিকের মধ্যে বাংলাদেশে ৪৫-৪৯% নারী কৃষিশ্রমিক হিসেবে কাজ করে। এর মধ্যে ৮৯.৫% নারীকে শস্য বপন, সংগ্রহ এবং প্রক্রিয়াজাত করনে দেখা যায়। কৃষিখাতে প্রায় ৯০% নারীর ভুমিকা গুরুত্বপূর্ন। এশিয়া ও আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশে নারী ১৩ ঘন্টার বেশী কাজ করে।

কৃষিকাজে পুরুষের তুলনায় নারী অধিক হারে কাজ করছে। কৃষি কাজের ২১টি ধাপের মধ্যে ১৭টি ধাপই সম্পন্ন করে নারী, তথাপি পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে নারীর কৃষিকাজ পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত নয় এবং কৃষি উন্নয়ন অধিদপ্তরের সেবা এবং সম্পদে অভিগম্যতা পাওয়ার জন্য যে কৃষিকার্ড প্রদান করা হয় তা থেকে নারী বঞ্চিত। নারীর উত্তরাধিকার ও সম্পদে সম-অধিকার এবং নিয়ন্ত্রণ না থাকায় নিজের ভূমি মালিকানা নেই বললেই চলে।

আমাদের দাবি

- কৃষক হিসেবে নারীর কাজের স্বীকৃতি প্রদান এবং কৃষক নারীর জন্য কৃষিকার্ড বরাদ্দ করা
- নারীর কৃষিকাজের আর্থিক মূল্যায়ন ও জিডিপিতে তার আয়ের অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করা
- কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে নারীর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা
- উত্তরাধিকার, সম্পত্তি ও জমিতে নারীর সম-অধিকার নিশ্চিত করা
- জমি ব্যবস্থাপনায় নারীর অধিকার নিশ্চিত করা
- নারীবান্ধব আধুনিক ও কৃষিপ্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং নারীর উপযোগী কৃষিযন্ত্র তৈরি করা
- সিডও সনদের ১৪ নং অনুচ্ছেদ- এর আলোকে গ্রামীণ নারীর কাজের ক্ষেত্রে কৃষি ও অন্যান্য ঋণ প্রাপ্তি, উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ, মর্যাদা ও আর্থিক মূল্যায়ন নিশ্চিত করা
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পানি ঘাটতি রোধে সেচসহ গৃহ ও কৃষিকর্মে পানি ব্যবস্থাপনায় নারীর অবদানের স্বীকৃতি দেওয়া
- কৃষিভিত্তিক কার্যক্রম ব্যবস্থায় নারীকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার করা
- অধিকারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলা
- কৃষিক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মজুরী, কর্মঘন্টা ইত্যাদি বৈষম্য দুরীকরণে আইন প্রণয়ণ এবং সংস্কার করা
- নারীর জন্য সহজ শর্তে কৃষিঋণসহ অন্যান্য ঋণ এবং সরকারিভাবে সকল বরাদ্দ ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা
- কৃষকাজে যুক্ত নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৯. গৃহস্থালী কাজ ও কল্যাণমুখী সমাজ

প্রেক্ষাপট

জীবন ও জীবিকার উন্নয়নে গৃহস্থালী কাজ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং বিশ্বজুড়েই এই সেবাকর্মের ভার পুরুষের তুলনায় নারী অনেক বেশি বহন করে। প্রচলিত জেন্ডার দৃষ্টিভঙ্গিও মনে করে, নারী বেশিরভাগ অবৈতনিক সেবাকর্মে- (সন্তান পালন ও সন্তানের পড়াশোনার দেখভাল করা, পরিবারের বৃদ্ধ ও অসুস্থ সদস্যদের সেবা-যত্ন, খাবার তৈরি, ঘরবাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং পানি ও জ্বালানি সংগ্রহ করা, ইত্যাদি) যুক্ত থাকবে।

বিভিন্ন গবেষনা সূত্রমতে, নারী দৈনিক ৬ থেকে ৭ ঘন্টা গৃহস্থালী সেবাকর্মে যুক্ত। বিপরীতে পুরুষ যুক্ত থাকে মাত্র ১ ঘন্টা। অন্যদিকে পুরুষ দৈনিক ৮ থেকে ৯ ঘণ্টা উৎপাদনমূলক কর্মকান্ডে যুক্ত, সেখানে নারী থাকে ৫ ঘন্টা। ঘুমানোর জন্য উভয়ই সমান সময় ব্যয় করে কিন্তু পুরুষ নারীর তুলনায় ২ ঘন্টা বেশী বিশ্রামে ব্যয় করে, ফলে নারী ঘরে ২ ঘন্টা বেশি সেবামূলক এবং উৎপাদনমূলক কাজ করে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর 'সময় ব্যবহার সংক্রান্ত জরিপ' থেকে জানা যায়, বেতনভুক্ত কাজের সঙ্গে জড়িত গ্রামীণ নারী পুরুষের তুলনায় সাড়েতিন ঘন্টা বেশি কাজ করে এবং গৃহস্থালি কাজে অধিক সময় ব্যয় করার ফলে তাদের বিশ্রামের সময় কম। শহরের নারীর ক্ষেত্রেও একই চিত্র, সুতরাং ঘরে এবং বাইরে উভয় ক্ষেত্রে নারী বহুমাত্রিক ভূমিকা পালন করে এবং অতিরিক্ত কাজ করে। অবৈতনিক গৃহস্থালী সেবাকর্মে নারীর এই অধিক মাত্রায় অংশগ্রহণের ফলে তাদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিসরে অংশগ্রহণের সুযোগ তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

নারী-পুরুষের গড় আয়ু বৃদ্ধির ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব সমাজে রয়েছে। নারী পুরুষের তুলনায় অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণভাবে দীর্ঘজীবন বাঁচে। এটি অবশ্যম্ভাবী যে, মানুষের আয়ু বৃদ্ধির ফলে ভবিষ্যতে বয়স বৃদ্ধিজনিত রোগবালাই বৃদ্ধি পাবে, ফলে সরকার ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি পরিবারকে গুরুদায়িত্ব নিতে হবে। এক্ষেত্রেও সেবা-শুশ্রুষার ভার শেষ পর্যন্ত নারীর উপরে গিয়েই পড়ে।

আমাদের দাবি

- অবৈতনিক সেবাকর্মে নারীর ভূমিকার যথাযথ মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি প্রদান এবং স্যাটেলাইট জিডিপি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা
- সহায়ক সেবার প্রচলন এবং অবৈতনিক সেবার শ্রম ও সময় কমানোর জন্য শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং পানি সরবরাহ, রান্নার গ্যাস সরবরাহ ও খাদ্য সংরক্ষণের প্রযুক্তি, ইত্যাদির ব্যবস্থা করা
- পরিবারে গৃহস্থালী কাজ ও দায়িত্ব পালনে প্রত্যেক সদস্য, বিশেষভাবে পুরুষ সদস্যের অংশগ্রহণকে উদ্বুদ্ধ করা, যেমন: সন্তান লালন পালন, গৃহস্থালী কাজে সহযোগিতা ইত্যাদি
- স্বাস্থ্য উন্নয়নে প্রযুক্তি ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির জন্য সুস্বাস্থ্য ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা (এসএমই) খাতে নারীর জন্য সহজশর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা

- নারীবান্ধব বাজারব্যবস্থা প্রচলন করা
- বিভিন্ন স্থানে নারীবান্ধব গণ-শৌচাগার নির্মাণ করা এবং ব্যবহারকারীর সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
- প্রচলিত ধারণা ভেঙে নারীর জন্য বৃহৎ পরিসরে ব্যবসার সুযোগ তৈরি করা
- উত্তরাধিকার ও সম্পত্তিতে সমান অধিকার নিশ্চিত করা
- দম্পতির অর্জিত সম্পদ বিবাহ বিচ্ছেদকালে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সমবন্টনের আইন প্রনয়ন করা।

১০. নারীর নিরাপদ অভিবাসন

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ জনশক্তি ও কর্মসংস্থান ব্যুরো'র তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বের ১৬৮টি দেশে এ পর্যন্ত ১ কোটি ৫২ লাখেরও অধিক বাংলাদেশী কর্মী বিদেশে গমন করেছে। ১৯৯১ থেকে মে ২০২৩ পর্যন্ত অভিবাসী নারীর সংখ্যা ১১,৪২,৩৩৫ জন। এই সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু অভিবাসন এখনো নারীর জন্য নিরাপদ নয়।

নারী শ্রমিকের গন্তব্য দেশসমূহ মূলত সৌদী আরব, লেবানন, জর্ডান, ওমান, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত ইত্যাদি। সাধারণত গৃহকর্মী হিসেবেই মধ্যপ্রাচ্যে কাজ করার সুযোগ রয়েছে বেশী। এছাড়া তৈরি পোশাক শিল্পেও নারী বিভিন্ন দেশে কর্মরত রয়েছে। কর্মীর দক্ষতার অভাব, পাসপোর্ট ও ভিসা প্রাপ্তির দীর্ঘসূত্রিতা এবং দালালের মাধ্যমে প্রক্রিয়া অভিবাসন প্রত্যাশীকে ঝুঁকিতে ফেলে। নারী অভিবাসী শ্রমিক শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতনসহ বিভিন্ন রকম সহিংসতার শিকার হয়, এমনকি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে দেশে ফিরতে বাধ্য হয়। মধ্যপ্রাচ্য ও মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশী শ্রমিক পৌঁছামাত্রই তার পাসপোর্ট ও আনুসঙ্গিক কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/গৃহকর্তা নিয়ে নেয়, ফলে শ্রমিকদের হাতে কোন বৈধ কাগজপত্র না থাকায় তাদের নানা সমস্যাসহ জেল-জরিমানা পর্যন্ত হয়। গৃহকর্মে নিয়োজিত শ্রমিকরা অনেক বেশী নির্যাতনের শিকার হন।

২০১৯ সালে বাংলাদেশী নারী অভিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে (১০৪,৭৮৬)। ২০২০ এবং ২০২১ সালে কোভিড মহামারীর কারণে সংখ্যা কমে গিয়েছিল (২০২০ এ ২১, ৯৩৪ এবং ২০২১ এ ৮০, ১৪৩)। যাই হোক, ২০২২ সালে সংখ্যা বেড়েছে (১০৫, ৪৬৬)। কোভিড মহামারী চলাকালীন কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা, মজুরি চুরি, অতিরিক্ত কর্মঘণ্টা, স্বাস্থ্যসেবার অভাব, পরিবারের সাথে যোগাযোগ রাখতে না পারা, বাড়িতে যেতে না দেওয়া বা বিনা কারণে বরখাস্ত হওয়াসহ অভিবাসী নারীদের কিছু সমস্যা ছিল। নারীরা গৃহকর্মী হিসেবে বিদেশে যাচ্ছেন এবং এ পেশায় ঝুঁকি বেশি।

আমাদের দাবি

<u>অভিবাসন পূর্ববর্তী</u>

- আইএলও সনদ ১৮৯, অর্থাৎ গৃহশ্রমিকের মর্যাদাপূর্ণ কাজের সনদ অনুস্বাক্ষর করা।
- কর্মী নিয়োগ ও প্রেরণ সংক্রান্ত আইন হালনাগাদ করা, আইনি প্রক্রিয়া সহজ ও মানসম্মত করা।

- সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারের সাথে বাংলাদেশ সরকারের শ্রমিক নিয়োগ ও সকল সুরক্ষা নিশ্চিত করতে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি করা যাতে শ্রমিকের স্বাস্থ্য, বেতন-ভাতা, নিরাপদ কর্ম পরিবেশ, বাসস্থান, কর্মঘন্টা, সাপ্তাহিক ছুটি ও বাংলাদেশ সরকারের পরিবীক্ষণের অধিকার, ইত্যাদি বিষয় সুরক্ষিত হয়।
- নারী শ্রমিকের জন্য প্রচলিত প্রশিক্ষণের মান উন্নয়ন, বহুমাত্রিক দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক ও সময়োপযোগী করা।
- কর্মক্ষেত্র বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন নতুন বাজার চিহ্নিত করা ও বিভিন্ন মর্যাদাপূর্ণ পেশায় প্রেরণ করা।
- নারীর অভিবাসন ব্যয় শূণ্য বিধান (Zero Migration Cost), অর্থাৎ অভিবাসনের সকল ব্যয়ভার নিয়োগকর্তা (Employer's Pay Model) কর্তৃক বহন নিশ্চিত করা।
- কর্মী ও নিয়োগকর্তা উভয়ের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিপত্রের অনুলিপি কর্মীর কাছে প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

অভিবাসনকালে

- গন্তব্যদেশে পৌঁছামাত্র কর্মীর দায়দায়িত্ব, পরিবেশ ও পরিস্থিতি, ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিতকরণ (Post arrival orientation) নিশ্চিত করা
- অভিবাসী নারীর নিরাপদ আবাসন নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার ও মালিকের সাথে চুক্তি যাচাই করা
- সংশ্লিষ্ট দেশের শ্রম-আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের শ্রমিকের সকল অধিকার নিশ্চিত করা
- দেশে রেখে যাওয়া শিশু সন্তানের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সকল অধিকার নিশ্চিত করা
- দুতাবাসে জনবল (লেবার এটাচি) বৃদ্ধিসহ সকল দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিবীক্ষণ করা।

ফেরত আসা অভিবাসী শ্রমিকের জন্য

- ফেরত আসা অভিবাসীদের তালিকা তৈরি করা এবং দক্ষতা অনুযায়ী তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, তাদের উপার্জিত রেমিট্যান্স এর যথোপযুক্ত বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরি করা
- নির্যাতনের শিকার শ্রমিকের নিজ পরিবার ও সমাজে মর্যাদার সাথে বসবাসের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া, যথা- কাউন্সেলিং ও স্বাস্থ্য সেবা, আয়মূলক কর্মকান্ডে যুক্তকরণ, ইত্যাদিসহ পুনঃ অঙ্গীভূত করা
- ধর্ষণের শিকার নারীশ্রমিক ও ধর্ষণের ফলে জন্ম নেয়া শিশুর দায়িত্ব সরকার কর্তৃক নেয়া এবং শিশুর নাগরিকত্ব নিশ্চিত করা
- নির্যাতনের শিকার গৃহশ্রমিকের ক্ষতিপূরণ ও ক্ষেত্রবিশেষে আইনি সহায়তা প্রদান, প্রাপ্য মজুরী আদায় নিশ্চিত করা
- প্রতারণার শিকার নারীর অর্থ ফেরত পাবার ব্যবস্থা করা ও প্রতারকদের আইনের আওতায় নিয়ে আসা।

১১. পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব:

প্রেক্ষাপট

পরিবেশগত বিপর্যয় সকলকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে। বাংলাদেশের বাস্তবতায় নারী যেহেতু পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী সেহেতু যেকোন বিপর্যয়ের প্রভাব নারীর উপর বেশি পড়ে।

পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বলতে আমরা প্রাথমিকভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে বুঝি। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে প্রাকৃতিক সম্পদে সাধারণ মানুষের অভিগম্যতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখনও এদেশের অর্থনীতি প্রধানত কৃষি ও প্রকৃতিনির্ভর, তাই জীবিকার জন্য বিপুলসংখ্যক নারী ও পুরুষ এখনও প্রাকৃতিক সম্পদের উপরই নির্ভর করে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠী, যার অর্ধেকই নারী- জীবিকা অর্জনের পাশাপশি ঘর-গৃহস্থালির মূল উপাদান এখনও প্রকৃতি থেকেই সংগ্রহ করে। আবার সনাতন যেসকল অনানুষ্ঠানিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে নারী সংসারের চাকা সচল রাখে তাও প্রকৃতিকেন্দ্রিক, যেমন: পরিবেশগত বিপর্যয়ে জলাশয় দুষিত হলে খাবারপানি সংগ্রহে বাড়তি চাপ নারীর উপরই পড়ে। ডোবা ও নদী-নালা হারিয়ে যাওয়া মানে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অতি প্রয়োজনীয় প্রাণীজ আমিষ হারিয়ে যাওয়া, যা মূলত নারীই সংগ্রহ করে। বায়ু দূষণ, গাছে ফলন না হওয়া, নোনাপানির চিংড়ি চাষে হাস-মুরগী ও গবাদিপশু পালন অসম্ভব হয়ে পড়ার কারণে নারীই বিপদগ্রস্ত হয়; কেননা পরিবারের খাদ্য তথা শাকসবজি, ডিম, দুধের চাহিদা মেটানোর প্রাথমিক দায়িত্ব নারীর উপরই বর্তায়।

বিকল্প অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত হওয়া কিংবা স্থানান্তরিত হওয়ার সুযোগ নারীর অপেক্ষাকৃত কম। প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাধারণত নারীর সামাজিক রক্ষাবলয়গুলো ভেঙ্গে পড়ে। নারী যে কেবল প্রাকৃতিক সম্পদের সীমিত অভিগম্যতা হারায় তা নয়, অনেক সময় পরিবারের সদস্য, এমনকি পারিবারিক বন্ধনও হারায়; তাই বলা যায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পরিবেশ বিপর্যয় এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মতো ধীরগতির কিন্তু স্থায়ী পরিবর্তনে নারীর জীবন ও জীবিকা, পরিবার ও সমাজের উপর দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

আমাদের দাবি

- পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনে সকল আইন, নীতিমালা ও কার্যক্রম নিয়মিত পর্যালোচনা, সংশোধন এবং প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন ও কার্যকর বাস্তবায়ন করা
- জীবিকা অর্জনের সুযোগ তৈরির জন্য প্রাকৃতিক সম্পদে অভিগম্যতা বৃদ্ধি এবং সম্পদ বন্টনে নারীকে অগ্রধিকার দেয়া
- দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় নারীর জন্য বিশেষ সুরক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করা
- উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নারীর মতামতকে গুরুত্ব দেয়া এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

গ. সমাজের চোখে নারী

১২. সংস্কৃতিতে নারী

প্রেক্ষাপট

পরিবার থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পরিমন্ডলে নারীর অবস্থা ও অবস্থান সংস্কৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, অর্থাৎ নারীর তথাকথিত ভাবমূর্তি নারীকে একটি নির্ধারিত গন্ডিতে আবদ্ধ রাখে এবং এর প্রভাব সমাজ সংসারে সর্বত্র। স্থান-কালের পার্থক্য সাংস্কৃতিক ভিন্নতার সৃষ্টি করে আবার একই সাংস্কৃতিক বলয়ে বসবাসরত মানুষের মধ্যে বিভেদ ও অসমতা তৈরি করে। সংস্কৃতিতে নারী-পুরুষের প্রভেদের ফলে প্রাচীনকাল থেকেই শিক্ষা, কর্ম ও উন্নয়নে নারীরা পিছিয়ে আছে এবং সমাজব্যবস্থা একদিকে পুরুষকে ক্ষমতাধর অন্যদিকে নারীকে করেছে ক্ষমতাহীন।

সমাজে সংস্কৃতির ধারা অনুসারেই নারীর বঞ্চনার প্রথা চলে আসছে, যেমন: একটি মেয়েশিশু জন্মলগ্ন থেকে তার পরিবার ও পরিবেশ পরিস্থিতির চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত হয়। সে পুরুষকে দেখে শক্তিশালী, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এবং সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হিসেবে। অন্যদিকে নারীকে দেখে দুর্বল, গৃহমুখী, অধীনস্ত অবস্থানে। তাকে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা দেয়া হয় না, ফলে নিজের অজান্তেই নারী মাত্রই কারো অধিনস্ত -এই চিন্তা-চেতনা ধারণ করে। একটু লক্ষ্য করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে, প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ও চর্চা নারীকে পরিবার ও সমাজ অবদমিত হওয়ার শিক্ষা দেয়। এখানে তার সকল অধিকার আবর্তিত হয় বাবা, স্বামী ও পুত্রসন্তানকে কেন্দ্র করে। নারীর শরীর এবং মনের উপর স্বামীর একক অধিকার পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে স্বীকৃত; সুতরাং সন্তান ধারণ এবং পরিবারে তার ভূমিকা সম্পূর্ণভাবে স্বামী এবং স্বামীগৃহের ব্যক্তিদের বিবেচনার উপর নির্ভরশীল। সন্তানের জন্মদান ও লালন-পালন এবং সংসারের সকলের সেবা-শুশ্রুষা নারীর জীবনে প্রধান কাজ বলে বিবেচিত।

সমাজ নারীকে সর্বংসহা, মাতৃরূপিনী ও সকল কামনা-বাসনা, লোভ, হিংসার উর্ধ্বে দেখতে চায়। তারা চায়, নারী সন্তান, স্বামী এবং পরিবারের জন্য নিজের ব্যক্তিগত সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে দেবীরূপে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে। অন্যদিকে যে নারী গতানুগতিক ঘর-সংসারের নিয়মের বাইরে থাকে, সে পতিতা, অর্থাৎ সমাজসংসার তার জন্য নয়। তার মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার সম্পূর্ণভাবেই অবহেলিত ও উপেক্ষিত। আর যে নারী এই দুই মেরুর মাঝখানে, তার অবস্থান কোথায়? দেবী অথবা

পতিতা নারী-সমাজ নারীর জন্য এই দুই অবস্থান বেঁধে দিয়েছে। যৌনকর্ম করে যে নারী জীবিকা নির্বাহ করে, সমাজ তাকে মর্যাদা না দিলেও তার অস্তিত্ব স্বীকার করে কিন্তু মধ্যবর্তী যে নারী সমাজে, পরিবারে গতানুগতিকভাবে জীবনযাপন করতে চায় না তাকে সইতে হয় অনেক দুর্ভোগ, দাঁড়াতে হয় সমাজের কাঠগড়ায়। বারবার জবাব দিতে হয় পরিবার ও সমাজের কাছে।

পরিবার এবং সমাজ প্রথা ও ধর্মীয় অজুহাতে নারীর উপর অন্যায় ও অবিচার করে। নারীর দৈনন্দিন জীবনে সবক্ষেত্রে ধর্মকে ব্যবহার করা হয় নারীকে নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে। নারীকে অবরুদ্ধ রাখা এবং অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় কর্মকান্ড থেকে বাদ দেয়া হয় ধর্মের অজুহাত দেখিয়েই। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ধর্মীয় আইনকে বলবৎ রেখে নারীর প্রতি বৈষম্যকে সুদৃঢ় করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ধর্ম ভিত্তিক আইনগুলো শুধু যে নারী-পুরুষের মধ্যকার বৈষম্যের প্রসার করছে তা নয় বরং বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার দ্বন্দ্ব বাড়াচ্ছে।

এতদসত্ত্বেও নারীরা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে যুক্ত হচ্ছে, স্বাক্ষর রাখছে নিজের সাফল্যের। দেশ ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে নারী উন্নয়নের জন্য নানামুখী উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। শিক্ষা নারীর অগ্রগতির প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে প্রাথমিক পর্যায় থেকে সকল পর্যায়ে নারীশিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। নারীর উপর সহিংসতা দূরীকরণে নানা ধরনের আইন প্রণীত হয়েছে। নারীর সুস্থভাবে বেড়ে ওঠা, নিরাপদ পরিবেশ, উপযোগী কর্মপরিবেশ তৈরির চেষ্টা চলছে। নারীর পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটেছে। নারী ভিন্ন ভিন্ন পেশা ও উচ্চপদে আসীন হচ্ছে। তথাপি ব্যক্তিনারী এখনো স্বাধীন নয় বরং পুরুষের নিয়ন্ত্রণে। নারীকে পুরুষের অধীনস্ত নয় বরং সমকক্ষ ভাবা নারীমুক্তি আন্দোলনের দাবি। এক্ষেত্রে নারীর প্রতি সহমর্মিতা নয় বরং প্রয়োজন সম-অধিকার নিশ্চিত করা।

আমাদের দাবি

- নারীকে সম-অধিকার ও সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে নীতি ও আইন সংস্কার করা
- বৈষম্যমূলক আচার-আচরণ ও প্রথা প্রতিহত করতে পদক্ষেপ নেয়া।

১৩. প্রচার মাধ্যম ও নতুন প্রযুক্তি

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের প্রচার মাধ্যম মূলত পুরুষপ্রধান। গবেষণায় দেখা যায়, দেশের ১০টি পত্রিকায় গড়ে ১০% নারীকর্মী যুক্ত। এরমধ্যে বহুল প্রচারিত ২টিতে ১২% এবং অন্যগুলিতে ৮%। ইলেক্ট্রনিক প্রচার মাধ্যমে আরো কম। দৈনিক খবরের কাগজ ও রেডিও, টেলিভিশনে সম্পাদক পর্যায়ে একেবারেই কম। নতুন প্রযুক্তিতেও নারী অনেক পিছিয়ে। এর কারণ তথ্য প্রযুক্তিতে নারীর ভীতি, অনাগ্রহ এবং দক্ষতা ও সুযোগের অভাব, ইত্যাদি। প্রচারমাধ্যমে নারীর অংশগ্রহণের হার কম হওয়ার অনেক কারণ রয়েছে, যেমন: রাতে কাজ করার বাধ্যবাধকতা, প্রতিবেদন সংগ্রহের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে যাওয়া- যা সমাজ ও পরিবার ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে না। এছাড়া প্রচারমাধ্যম কর্তৃপক্ষ'র দৃষ্টিতে নারী সকল দায়িত্ব পালনে যোগ্য ও দক্ষ নয়। কর্মক্ষেত্রে ও বাইরে নারীর নিরাপত্তা একটি বড় বিষয়। প্রচারমাধ্যমের কর্মপরিবেশও নারীর জন্য উপযুক্ত নয়। এসব কারণে নারী কাজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

মানসম্মত জীবনযাপনে তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ অপরিহার্য কিন্তু এক্ষেত্রে নারী অনেক পিছিয়ে। বাল্যবিবাহ, গৃহস্থালী দায়িত্ব, ইত্যাদি কারণে মেয়েশিক্ষার্থী শিক্ষার দ্বিতীয় স্তর থেকে ঝরে পড়ে। উচ্চ শিক্ষা ও বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীর সংখ্যা কম। বর্তমানে শিক্ষা মুলত গৃহশিক্ষক বা কোচিংনির্ভর। সাধারণ শিক্ষার তুলনায় বিজ্ঞান শিক্ষা অধিকতর ব্যয়সাপেক্ষ। অধিক ব্যয় এবং যাতায়াত, গৃহশিক্ষক ও কোচিং সেন্টারে নিরাপত্তাহীনতার জন্য নারী মানবিক বিভাগেই বেশী আগ্রহী হয়। এছাড়া, নারীশিক্ষার প্রতি অনীহা, অভিগম্যহীনতা, আত্মশক্তির অভাব নারী ও মেয়েশিশুকে তথ্যপ্রযুক্তি থেকে দূরে রেখেছে।

নতুন প্রযুক্তি আমাদের জন্য আর্শীবাদ কিন্তু এর অপব্যবহারে নারীর উপর সহিংসতা, যৌন হয়রানি ও সাইবার অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে। একদিকে কর্মক্ষেত্র ও রাস্তাঘাটে নারীর বিচরণ বাড়ছে অন্যদিকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বা ইন্টারনেটে নারীর উপর সহিংসতার ঝুঁকিও বাড়ছে।

আমাদের দাবি

- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিশিক্ষাকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারী ও মেয়েশিশুকে বিশেষ বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত ও সম্পৃক্ত করা
- প্রযুক্তিসামগ্রী অর্থাৎ কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ইত্যাদি, শিক্ষা উপকরণ সহজলভ্য করা
- প্রশিক্ষক তৈরি করা এবং তাদেরকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেওয়া
- প্রযুক্তিনির্ভর কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করা
- নারীর জন্য আউটসোর্সিং কাজের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
- মানবাধিকারের মানদন্ড অনুযায়ী প্রস্তাবিত 'সাইবার সিকিউরিটি আইন, ২০২৩ সংশোধন করা
- প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধ করা
- নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহারে নারীর সচেতনতা বৃদ্ধি করা
- প্রচার মাধ্যমে নারীর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরা
- প্রচারমাধমে নারীবান্ধব পরিবেশ তৈরি করা
- প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করে নারীর নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করা
- প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে মাতৃত্বকালীন ছুটি নিশ্চিত করা
- শিশু-দিবাযত্ন কেন্দ্রের ব্যবস্থা রাখা।

১৪. উন্নয়নের মূলধারায় জেন্ডার সমতা অন্তর্ভুক্তি

প্রেক্ষাপট

জেন্ডার সমতা উন্নয়ন কর্মকান্ডে অন্তর্ভুক্তিকরণ নারীর সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি কৌশল। সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা, ভিয়েনা ঘোষণা, শিশু অধিকার ও নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ, ইত্যাদি দলিল নারী-পুরুষের জীবন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সম-অধিকার প্রতিষ্ঠায় নীতি, আইন ও

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোসহ সম্পদ বন্টনের বিষয়সমূহকে গুরুত্ব দিয়েছে। জেন্ডার সমতা মানুষের অধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং গণতন্ত্র উন্নয়নের হাতিয়ার।

জেন্ডার সমতা সকল লিঙ্গের অবস্থা ও অবস্থান বিশ্লেষণ করে প্রত্যেক ক্ষেত্রে ও পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা করে থাকে, যেমন: আইন প্রনয়ন, নীতি ও কর্মসূচি পরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ, ইত্যাদি।

জেন্ডার বৈষম্য এবং নারীর উপরে সহিংসতা দূরীকরণে পুরুষ ও ছেলেশিশুরও যুক্ত হওয়া অত্যাবশ্যক। এই যুক্ততায় একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও মর্যাদাবোধ বৃদ্ধি পাবে। সম্মিলিত এ উদ্যোগ প্রতিটি মানুষের অধিকার ও সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করবে।

সকল নীতি, আইন এবং কর্মসূচি বিবেচনায় নেয়া, যা মানুষের জীবন-জীবিকা, উন্নয়নের মূলধারা এবং ব্যক্তিগত জীবনাচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এসকল নীতি এবং কর্মসূচিসমূহ নারী, পুরুষ এবং তৃতীয়লিঙ্গের চাহিদা পূরণ করে এর সুফলসমূহ নারী, পুরুষ ও তৃতীয়লিঙ্গের মধ্যে সমান ভাবে বন্টন করে। সর্বোপরি এই প্রক্রিয়া নারী, পুরুষ ও তৃতীয়লিঙ্গের মধ্যে সম্পদ, আয় এবং উপার্জনের সুযোগ-সুবিধাসমূহের মধ্যে বৈষম্য দূর করার চেষ্টা করে। এরজন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক অঙ্গীকার, জেন্ডারভিত্তিক সমতার নীতি, জেন্ডারসম্পর্ক বিষয়ে মৌলিক ধারণা, প্রশাসনিক প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট জ্ঞান, পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ, দক্ষ মানবসম্পদ এবং সর্বোপরি সকল কর্মকান্ডে নারী, পুরুষ ও তৃতীয় লিঙ্গের সম-অংশগ্রহণ। বাংলাদেশে ৮ম পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনায় জেন্ডারসমতার বিষয়টি আরও জোরদার করা হয়েছে এবং একটি আলাদা অধ্যায় রয়েছে, তবে বাস্তবায়নকারীদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা ও জ্ঞানের অভাব, অপর্যাপ্ত বাজেট, ইত্যাদি কারণে বাস্তবায়ন সন্তোষজনক নয়।

আমাদের দাবি

- জেন্ডার সমতা অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রয়োজন চাহিদা বিশ্লেষণ, দেনদরবার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ এর দক্ষতা ও ক্ষমতা; অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের সকলের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা
- প্রতিটি প্রতিষ্ঠান, আইন ও নীতি, কর্মসূচি, সকল নারী-পুরুষ ও তৃতীয়লিঙ্গের প্রয়োজন, স্বার্থ ও ন্যায্যতা ইত্যাদির ভিত্তিতে তৈরি করা
- নারী ও তৃতীয়লিঙ্গের জন্য সুনির্দ্দিষ্ট করে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া, তাদের কথা শোনা এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা
- প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের জেন্ডারসমতা অন্তর্ভুক্তি প্রক্রিয়া মূল্যায়ন করা
- সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের জেন্ডারসমতা অন্তর্ভুক্তি করা
- পরিবার ও সমাজে জেন্ডারসমতা বিষয়ে ধারণা প্রদানের ব্যবস্থা করা
- 'টেকসই উন্নয়নের ৫নং লক্ষ্যমাত্রা' অনুযায়ী জেন্ডারসমতা অন্তর্ভুক্তি করা এবং এজন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ রাখা।

ঘ. ব্যক্তি নারী

বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় নারী মর্যাদাসম্পন্ন স্বতন্ত্র মানুষ হিসেবে গণ্য নয়। নারী মা, বোন, স্ত্রী, ও কন্যা হিসেবে পরিচিত। সংস্কৃতি, ধর্ম, প্রথা, বিশ্বাস এবং চর্চা নারীর এই পরিচিতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য ভূমিকা রাখছে রাষ্ট্রীয় নীতি, আইন ও বিধিবিধান। ব্যক্তি নারীর স্বতন্ত্রতা বা তার নিজস্ব পরিচয় না থাকলেও যখন নারী যৌন আক্রমণের শিকার হয় তখন বিষয়টি পরিবারের সম্মান ও ইজ্জতের সাথে যুক্ত করে নারীকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়।

১৫. সহিংসতামুক্ত নারীর জীবন

প্রেক্ষাপট

নারীর উপর সহিংসতা ও যৌন নির্যাতন শুধুমাত্র নারীর শরীরের উপর আক্রমণই নয় বরং নারীর উপর সহিংসতার মাত্রা, প্রকার ও ধরনের নৃশংসতা। এই পরিস্থিতি নারীর নিরাপত্তাহীনতাকে আরো প্রকট করে তুলেছে। নারী নিজ গৃহে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, খেলার মাঠে, বাজার-ঘাটে, পরিবহণে ও কর্মক্ষেত্রে কোথাও নিরাপদ নয়। লোকচক্ষুর আড়ালে নারী নির্যাতনের শিকার হয় এবং চরম নিরাপত্তহীনতার মধ্যে বসবাস করে; ব্যাহত হয় তার স্বাভাবিক বিকাশ ও জীবনযাত্রা। ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের শিকার নারীকেই দোষারোপ করা হয়। নির্যাতনের শিকার নারী এবং পরিবারের সম্মানহানির বিষয়টি সমাজে প্রকটভাবে সামনে উঠে আসে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে শিশু বা বৃদ্ধ নারী- কেউই মুক্ত নয়। এখনও পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় দলিল-পত্রাদি ও বক্তব্যে ১৯৭১ সালে যৌন আক্রমণ ও ধর্ষণের শিকার নারীর শারিরীক ও মানসিক আঘাতের চেয়ে ইজ্জতহানির বিষয়টি অধিক গুরুত্ব পায়। বেসরকারি ও সামাজিক পর্যায়েও একই অবস্থা বিরাজমান।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো জরীপ ২০১৫ অনুযায়ী ৮০% বিবাহিত নারী নির্যাতনের শিকার হয় এবং তাদের অনেকেই স্বামী দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার। বাংলাদেশের আইনে বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে জোরপূর্বক যৌন সম্পর্ক অপরাধ হিসেবে স্বীকৃত নয়। পারিবারিক নির্যাতনকে এখনও ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে চাপা দেয়ার চেষ্টা হয়।

নারীর উপর সহিংসতা দমনে পৃথক আইনে অপরাধের সংজ্ঞা ও আইন বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় কিছু সংযোজন হলেও মূলত ১৮৬০ সালের দন্ডবিধি ও ১৮৯৮ সালে ফৌজদারী কার্যবিধির অংশবিশেষ মাত্র। জামিন পাবার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত করা এবং যাবজ্জীবন ও মৃত্যুদন্ডের বিধান রাখায় অনেকে আইনটিকে ইতিবাচক মনে করে। বাস্তবে তথাকথিত কঠিন এই আইনের ব্যাপকভাবে অপপ্রয়োগ হচ্ছে। উপরন্তু শাস্তি সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে বিচারকের "নিজস্ব বিবেচনার ক্ষমতা"কে সঙ্কুচিত করেছে, ফলে "হয় শাস্তি, নয় খালাশ"-এই নীতির প্রয়োগ হচ্ছে অনেক বেশী। এসব কারণে সার্বিকভাবে ন্যায়বিচার ব্যাহত হচ্ছে এবং আইনের সুফল থেকে নারী বঞ্চিত হচ্ছে।

আমাদের দাবি

- ধর্ষণ, যৌতুক, যৌননিপীড়ন ও উত্ত্যক্তকরণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রচলিত আইনসমূহ নারীর সর্বোচ্চ স্বার্থ ও সম-অধিকার বিবেচনায় সংশোধন ও পরিমার্জন করা
- বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে জোরপূর্বক যৌনসম্পর্ককে ধর্ষণ হিসেবে ফৌজদারী আইনে অন্তর্ভূক্ত করা
- "পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০"এর ব্যাপক প্রচার, বাস্তবায়ন এবং পর্যালোচনা করে যুগোপযোগী করা
- ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থাকে পক্ষপাতিত্ব, দুর্নীতি ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করা এবং বিচার প্রাপ্তিতে নারীর অভিগম্যতা তৈরি করা
- বিচার বিভাগের জনশক্তি বৃদ্ধি এবং সহিংসতা প্রতিরোধে বাজেটে সুনির্দিষ্ট খাতওয়ারী বরাদ্দ রাখা
- নারীকে সম-মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায় থেকে সকল পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকে প্রয়োজনীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা
- নারী নির্যাতনের মামলা দায়ের ও তদন্ত, মামলা নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানে শক্তিশালী পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা কার্যকর করা, যেমন: মানবাধিকার কমিশন, স্বরাষ্ট্র, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ইত্যাদি
- সরকারি-বেসরকারি সংগঠন ও প্রচার মাধ্যমের যৌথ উদ্যোগে নারীর উপর সহিংসতার কুফল নিয়ে জনসচেতনতামূলক দীর্ঘমেয়াদী সমন্বিত কর্মসূচি নেয়া
- ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ের নারীনির্যাতন প্রতিরোধ কমিটিসমূহকে কার্যকর ও সক্রিয় করা এবং জবাবদিহিতার আওতায় আনা
- অভিন্ন পারিবারিক আইন পাশ করা
- রাষ্ট্রীয় দলিল-পত্রাদিতে, সরকারি-বেসরকারি শব্দচয়নে, লিখনে ও বলনে বা ভাষণে এবং ভাষা ও শব্দ ব্যবহারে নারীর প্রতি মর্যাদাহানিকর ভাষা ব্যবহার বন্ধ করা
- হটলাইন নম্বর সেবাগ্রহণ সহজীকরণ এবং নির্যাতনের শিকার নারীর জন্য আশ্রয়কেন্দ্র বিস্তৃত করা।

১৬. নারীর স্বাস্থ্য এবং যৌন ও প্রজনন অধিকার

প্রেক্ষাপট

স্বাস্থ্যের প্রতি নারীর নিজের ও পরিবারের অবহেলা, অসচেতনতা ও অধিকারবোধহীনতা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য এবং সর্বোপরি রক্ষণশীল ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কারণে নারী অধিকারভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত।

নারীর প্রজনন ক্ষমতা, প্রজনন অঙ্গসমূহ, যৌনক্ষমতা ও যৌনাঙ্গ সর্ম্পকে সামাজিক মূল্যায়ন ও দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক নয়। সর্বোপরি নারীর প্রজনন ক্ষমতাকে শক্তি হিসেবে বিবেচনা না করে তাকে অবদমিত করা হয়। নারীর প্রতি বৈষম্য, অবমূল্যায়ন ও তাকে অধিকারহীন করে রাখার মূলে রয়েছে নারীর শরীর। নারীর শরীরের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ তার মৌলিক অধিকার, তাই এর উপর অযাচিত হস্তক্ষেপের বিরূদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ "শরীর আমার সিদ্ধান্ত আমার"।

জীবন ও জীবিকার সংগ্রামের সাথে সুস্বাস্থ্য, যৌনতা ও যৌন-অধিকার অভিন্ন বিষয়। নারীর স্বাস্থ্য-অধিকার আন্দোলন মা ও শিশুসহ সব বয়সের নারীর জন্য এবং তার বেঁচে থাকার অধিকারের সাথে যুক্ত। সন্তান প্রসবপূর্ব ও পরবর্তী জটিলতা নারীর জীবনকে আরো বেশী ঝুঁকিতে ফেলে। প্রসূতিমৃত্যু নারীর বেঁচে থাকার অধিকার লঙ্ঘন করে, যা নারীর মানবাধিকার।

নিরাপদ, কার্যকর, সহজলভ্য এবং গ্রহণযোগ্য জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি পছন্দ করা নারীর অধিকার। একজন নারীর গোটা জীবনচক্রে সেবার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যেকোন সময় প্রয়োজন। সম্মান, মর্যাদা এবং ন্যায্যতার ভিত্তিতে কিশোরী স্বাস্থ্যসেবা, গর্ভধারণ পূর্ব , গর্ভধারণ এবং প্রসব পরবর্তী সেবা পাওয়া নারীর অধিকার ।

নারীর স্বাস্থ্য ও প্রজনন অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশে প্রসূতিমৃত্যু হ্রাস এবং নিরাপদ প্রসব ও মাতৃস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় জবাবদিহিতার অভাব প্রকট। ১৯৯৪ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত 'জনসংখ্যা ও উন্নয়ন' বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গৃহীত কর্মসূচি, ১৯৯৫ সালে বেইজিং এ চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলনের ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনায় নারীর স্বাস্থ্য গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হিসেবে গণ্য হয়। পরবর্তীতে নারীর সামগ্রিক স্বাস্থ্য আলোচনায় 'যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার' বিষয়টি স্বীকৃতি লাভ করে। গত তিন দশকে মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য সুরক্ষায় অগ্রগতি হয়েছে এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়সূচির উপর ভিত্তি করে স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন নীতিমালা প্রণীত হয়েছে; তথাপি বাংলাদেশে এই সংক্রান্ত আইন, নীতি ও কর্মসূচি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানের সাথে সমকক্ষ নয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়সহ ৪০টি মন্ত্রণালয়ে জেন্ডারবাজেট অনুশীলন শুরু হলেও নারীর প্রজননস্বাস্থ্য সেবার জন্য পৃথক বাজেট বরাদ্দ রাখার বিষয়টি এখনও গুরুত্ব পায়নি।

সরকারী স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্রে দক্ষ কর্মীর অভাব ও চিকিৎসকের শূণ্যপদ এবং তাদের অনুপস্থিতি; যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব; যন্ত্রপাতি ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্থাপনা রক্ষণাবেক্ষণে দুর্বলতা ও প্রশাসনের জটিলতা; ওষুধ সরবরাহের অপর্যাপ্ততা ও অপব্যবহার; সুসংগঠিত রেফারেল পদ্ধতির অভাব, দুর্নীতি এবং স্বাস্থ্য অবকাঠামোর পূর্ণ সদ্ব্যবহার না হওয়া, ইত্যাদি কারণে স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি বড় বাধা এবং নারীর জন্য তা আরো প্রকট।

আমাদের দাবি

স্বাস্থ্যসেবায় নারীর অভিগম্যতা

- নারীস্বাস্থ্য, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকারের বিষয়টি পারিবারিক ও সামাজিকভাবে উপেক্ষিত, তাই গণমাধ্যম ব্যবহার করে এ বিষয়গুলোতে সচেতনতা বৃদ্ধি করা
- নারীর পুরো জীবনচক্রে ধারাবাহিক ও মানসম্মত সেবার ব্যবস্থা এবং কিশোরীর অংশগ্রহণ ও পুষ্টির বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা
- স্বাস্থ্যসেবায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, সমন্বয় ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত জনবল এবং সর্বক্ষেত্রে বাজেট বৃদ্ধি করা
- নারী ও কিশোরীর প্রতি মর্যাদাপূর্ণ ও সংবেদনশীল আচরণ, আন্তরিকতা ও ধৈর্যসহকারে সেবা প্রদানের জন্য আচরণবিধি তৈরি ও বাস্তবায়ন করা
- চিকিৎসা সংক্রান্ত সকল তথ্যের গোপনীয়তা নিশ্চিত করা
- দক্ষ জনশক্তি বৃদ্ধি এবং সেবাকেন্দ্রে তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা
- অনিয়ম ও দুর্নীতি নির্মূল করা।

প্রসূতি স্বাস্থ্য

- গর্ভাবস্থা, প্রসবপূর্ব ও পরবর্তী সকল সময়ে ২৪ ঘন্টা জরুরী প্রসূতিসেবা, জটিল স্বাস্থ্য সেবার জন্য সমন্বিত কার্যক্রম সহজপ্রাপ্য করা এবং প্রসূতির জীবন রক্ষায় দ্রুত ও দক্ষতার সাথে সেবা প্রদান করা
- প্রসূতির মতামতের প্রেক্ষিতে সম্ভব হলে নিজ বাড়িতে নিরাপদে সন্তান প্রসবের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা
- প্রসূতিমৃত্যু সংক্রান্ত নির্ভুল তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য অত্যাবশ্যকীয় তথ্য নিবন্ধনপ্রক্রিয়া (ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন) চালু ও শক্তিশালীকরণে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গকে প্রসূতিমৃত্যুর তথ্য সঠিকভাবে লিপিবদ্ধকরণে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া
- সকল প্রসূতিমৃত্যু অর্থাৎ বাড়িতে, হাসপাতালে যাবার পথে ও মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা ইত্যাদির তথ্য অবশ্যই তালিকাভুক্ত করা।

পরিবার পরিকল্পনা

- পরিবারপরিকল্পনা পদ্ধতিসমূহ নিরাপদ, কার্যকর, সহজলভ্য, প্রয়োজনীয় এবংগ্রহণযোগ্য জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি পছন্দ করার সুযোগ সৃষ্টি করা
- অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ ও ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভপাত বন্ধ করা।

যৌনস্বাস্থ্য

- যৌনতা ও যৌনসম্পর্কের প্রতি ইতিবাচক ও শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টিভঙ্গি ও চর্চায় বয়সভিত্তিক সমুন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

১৭. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ সংবিধানের মূলনীতির আলোকে ১৯৯০ সালে বাধ্যতামুলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রবর্তন হয়। জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ প্রতিটি রাষ্ট্রের শিশুশিক্ষার বিষয়টি প্রাধান্য দিয়েছে। বেইজিং কর্মপরিকল্পনা ও বাংলাদেশের নারী উন্নয়ন নীতিতেও মেয়েশিশুর শিক্ষা অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ সালে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছে। এর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ও চর্চা করা। প্রান্তিক ও দরিদ্রসহ সকল শিশু জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত হবে এবং সমাজের উন্নয়ন হবে। শিশুরা বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে এবং ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দেবে। সকল শিশু সমান সুযোগ পাবে এবং মানসম্মত শিক্ষা পাবে। বাস্তবতা হচ্ছে, বর্তমানে চার ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা রয়েছে, যেমন: বাংলা ও ইংরেজী মাধ্যম, মাদ্রাসা ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা; ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য প্রকট।

২০১৭ সালে বিবিএস, ডায়াকনিয়া ও ইউসেপ এর যৌথ গবেষণায় দেখা যায়, ২০১৫ সালে মেয়ে ও ছেলেশিশু যথাক্রমে প্রাথমিক স্তরে (১ম-৫ম) ৯৮% ও ৯৭%, দ্বিতীয় স্তরে (৬ষ্ঠ-১০ম) ৬২.১৬% ও ৭১.৮৫% ভর্তি হয়েছে। সকল শিশু ৫ম শ্রেণি পাশ করলেও দ্বিতীয় স্তরে মাত্র ৫৪% মেয়ে শিশু এসএসসি এবং ৬৬.২৮% ছেলেশিশু পাশ করেছে, অর্থাৎ ঝরে পড়ার হার মেয়ে ৪৫%, ছেলে ৩৩.৭২%; তবে করোনাকালীন অনেক মেয়ে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে এবং বাল্যবিয়ের শিকার হয়।

মেয়েশিক্ষার হার কমে যাওয়ার প্রধান কারণ দারিদ্র, নিরাপত্তাহীনতা, বাল্যবিয়ে, বাবা মায়ের অনিচ্ছা, ইত্যাদি। যদিও সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে শিক্ষায় মেয়েদের সুযোগ বেড়েছে, তবে শিক্ষার মান নিয়ে অনেক প্রশ্ন রয়ে গেছে। এর বড় কারণ হচ্ছে, দুর্বল শিক্ষাব্যবস্থা- যথা: দুর্নীতি, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতার অভাব। তাছাড়া গ্রাম ও দুর্গম এলাকায় শিক্ষকের অনুপস্থিতি ও শূণ্যপদ, শিক্ষকদের গুনগত মানের অভাব। প্রশাসনের কার্যকর পরিবীক্ষণের অভাবও এর জন্য দায়ী। এছাড়া, শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি পাঠ্যক্রমের ভিন্নতা ও গুণগত মানের পার্থক্য পেশা গ্রহণের ক্ষেত্রে অনেক বড় ধরনের বৈষম্য সৃষ্টি করছে।

আমাদের দাবি

- ২০০৯ সালের শিক্ষানীতির কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে ন্যুনতম মানসম্মত শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থার মান উন্নয়ন করা, মানবিক মূল্যবোধ ও উদার মানসিকতা তৈরি করা
- কারিগরি, কৃষি, গৃহস্থালী, জীবন ও কর্মমুখী এবং বহুমুখী শিক্ষার প্রচলন এবং নারীর জন্য বিজ্ঞান শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করা
- উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে একইসাথে বিভিন্ন ধরনের বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করার সুযোগ, যেমন: বিজ্ঞান, কলা, ব্যবসা থেকে বিভিন্ন বিষয় পছন্দ করার সুযোগ রাখা
- সরকারি, বেসরকারি, ইংরেজি ও মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সমতা ও সমন্বয় করা
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সকল শিশুর জন্য একীভূত শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা
- মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য বিশেষায়িত শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

১৮. বিশেষ অবস্থায় নারী

বাংলাদেশে বিভিন্ন জাতিসত্ত্বা, ভাষা, ধর্ম- বর্ণ, পেশা, গোত্র ও মতাদর্শের নারীর বসবাস। সংবিধান সকল নাগরিকের সম-অধিকার নিশ্চিত করলেও বিশেষ পরিস্থিতি বা অবস্থার কারণে রাষ্ট্রীয় ও গণজীবনে সকলে সমান অধিকার ভোগ করতে পারেনা, যেমন:

বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার নারী

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে বাঙালি ছাড়াও ৪৫টির অধিক জাতিসত্ত্বার বসবাস রয়েছে, যেমন: সাঁওতাল, ওঁরাও, চাকমা, মারমা, ম্রং, গারো, হাজং, ত্রিপুরা, মুন্ডা, ইত্যাদি। বিভিন্ন তথ্য অনুযায়ী এদের সংখ্যা ৩০ লাখের কাছাকাছি এবং এর প্রায় অর্ধেক নারী। এই জাতিগোষ্ঠী জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী নিজেদেরকে আদিবাসী হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতির জন্য আন্দোলন করে আসছে। সংবিধান তাদের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা ও উপজাতি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

স্বাধীনতার অর্ধশতাধিক বছর পরও এদেশের বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার নারীরা রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে সম-অবস্থানে নেই এবং ভৌগলিক কারণেও তারা অধিকার বঞ্চিত। বলা বাহুল্য, ইতোমধ্যে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নারীর সম-অধিকার ও সমমর্যাদার বিষয়টি গুরুত্ব পেলেও বাস্তবে সামগ্রিকভাবে নারী শোষণ, বৈষম্য, বঞ্চনা, অবহেলা, নিপীড়ন ও সহিংসতার শিকার হচ্ছে; বিশেষভাবে এসকল নারী প্রতিনিয়ত মানবাধিকার লংঘন এবং জাতিগত আগ্রাসন, সহিংসতা ও বৈষম্যের শিকার।

বাংলাদেশে এই জনগোষ্ঠী পাহাড় বা সমতলে কঠিন সংগ্রাম ও লড়াই করে বেঁচে আছে। একদিকে পার্বত্য জেলাসমূহে সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, অন্যদিকে পাহাড়ী ও বাঙালি সেটেলারদের মধ্যে সংঘাত লেগেই আছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে এই জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের নামে ভূমি দখল, ভূমির কারণে নারীর উপর যৌন হয়রানি ও ধর্ষণ, মিথ্যা মামলা ইত্যাদি নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। এই জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকায় খনিজসম্পদ উত্তোলনের ফলে ভূমি উচ্ছেদকরণসহ নানা ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। সার্বিকভাবে এই জনগোষ্ঠী প্রান্তিক অবস্থায় জীবন যাপন করছে।

আমাদের দাবি

- সংবিধানস্বীকৃত ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, উপজাতি এবং আদিবাসী পরিচিতিকেন্দ্রিক বিতর্কের দ্রুত গ্রহণযোগ্য সমাধান করা
- বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর নারী ও শিশুর উপর সহিংসতা বন্ধ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
- সহিংসতার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় নিয়ে আসা
- জাতীয় সংসদে অঞ্চলভিত্তিক এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা

- শিক্ষা ও কর্মসংস্থান থেকে শুরু করে সকলক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা
- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করাসহ ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের বিধি-বিধান যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা
- পার্বত্য অঞ্চলে সেনাবাহিনীর দ্বারা ধর্ষণ, লুটপাট, অত্যাচারের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা
- পার্বত্য এলাকায় প্রণীত শান্তিচুক্তি আলোচনার মাধ্যমে সংশোধন ও কার্যকর বাস্তবায়ন করা
- এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও নারী উন্নয়ন নীতিমালাসহ সকল ধরনের নীতিমালা প্রণয়নে এই জাতিগোষ্ঠীর নারীদের পরামর্শ গ্রহণ করা।

১৯. দলিত ও হরিজন নারী

প্রেক্ষাপট

দলিত ও হরিজন জনগোষ্ঠীর মতে, বাংলাদেশে দলিত হরিজন জনগোষ্ঠীর সংখ্যা এক কোটির ওপরে। তাদের পরিচিতি হচ্ছে পেশা, ধর্ম ও নৃতাত্ত্বিক, যেমন: বাজনদার, পালকি বাহক, ধোপা, ডোম, জেলে, কাপালি, কাউরা, নমশুদ্র, ঋষি, নাপিত, পরিচ্ছন্নতাকর্মী ইত্যাদি। সমাজে তারা অচ্ছুৎ। তারা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও কর্মক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা এবং অধিকার থেকে বঞ্চিত। ঐতিহাসিকভাবে দলিত জনগোষ্ঠী সমাজের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন ও সুনির্দিষ্ট পেশার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

দলিত জনগোষ্ঠীর নারী এবং মেয়েশিশুর প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতনের মাত্রা আরও প্রকট। তারা দুইভাবে নিগৃহীত, প্রথমত: দলিত হিসেবে গোটা সমাজে, দ্বিতীয়ত: নারী হিসেবে নিজ সমাজে। শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রেও দলিত জনগোষ্ঠী, বিশেষভাবে মেয়েশিশু বৈষম্যের শিকার হয়। স্কুলে দলিত শিশুদের সব সময় পিছনের বেঞ্চে বসতে হয়। তাদের ভর্তি নেয়ার ক্ষেত্রেও অনীহা এবং শিক্ষক ও সহপাঠিদের অসম আচরণ এবং তাদের দিয়ে শৌচাগার পরিস্কার করানোসহ আরও অনেক কিছু। একদিকে তারা শিক্ষার সুযোগ কম পায়, অন্যদিকে এই আচরণের ফলে তারা ঝরে পড়ে। শিক্ষা, কর্মসুযোগ, খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনসহ সবকিছু থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে তারা পিছিয়ে পড়ে।

হরিজনদের কলোনীভিত্তিক বসবাস এবং তারা মাষ্টাররোলে বেতন পায়, ফলে মাতৃত্বকালীন ছুটি, উৎসবভাতা ইত্যাদিসহ আইনী সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত। নারীকর্মীর মাতৃত্বকালীন সময়ে তার নিজ বেতন থেকে বদলি কর্মী দিয়ে কাজ করায়। পরিচ্ছন্নতাকর্মীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে মূল্যায়ন তো করা হয়ই না বরং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে তারা প্রতিনিয়ত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, অবহেলা-অসম্মান ও নির্যাতনের শিকার হয়।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দলিতনারী অনানুষ্ঠানিক কাজ করে এবং মজুরিবৈষম্যের শিকার হয়। তারা তৈরিপোশাক কারখানা বা ঘরের বাইরে কাজ করতে আগ্রহী কিন্তু পরিবারের পুরুষ সদস্যদের এই কাজ করতে অনুমতি না থাকায় তারা আর্থিক সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। হরিজন ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের নারী গৃহকর্মী হিসেবে যুক্ত হতে পারে।

দলিত ও হরিজন সমাজে মেয়েদের বাল্যবিয়ের হার অত্যন্ত বেশী এবং যৌতুক সমস্যাও প্রকট।

হরিজনদের ক্ষেত্রে নিজস্ব বিচার-সালিশ কাঠামোতে (পঞ্চায়েত) নারীদের উপস্থিতি নেই বললেই চলে। পারিবারিক কলহের বিচার- সালিশে ভুক্তভোগী নারীর উপস্থিতির অনুমোদন নেই। সালিশে পুরুষ ভুক্তভোগী নারীর প্রতিনিধিত্ব করে এবং সালিশের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হয়। বিবাহবিচ্ছেদের সুযোগ নেই, তাই ভুক্তভোগী বহু নারী স্বামী ও পরিবারের অত্যাচার সারা জীবন মুখ বুজে সহ্য করে। নারীর সুরক্ষায় বিদ্যমান আইন সম্পর্কে এই জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগ মানুষ জানেনা এবং বিচার ব্যবস্থায় তাদের অভিগম্যতা সীমিত।

আমাদের দাবি

- বৈষম্যবিলোপ আইন প্রণয়ন করা
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ও কর্মক্ষেত্রে কোটা বাস্তবায়ন করা
- ভূমিহীন দলিত ও হরিজন জনগোষ্ঠীর জন্য সরকারি উদ্যোগে আবাসন তৈরি এবং সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা
- কলোনীতে বসবাসরত হরিজন নারী-পুরুষ উভয়ের নামে স্থায়ী বন্দোবস্ত দেয়া
- দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের শিশুকে মূল ধারার শিক্ষা কার্যক্রমে টিকে থাকতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নজরদারীর আওতায় আনা এবং দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা
- কর্মমুখী শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা
- সরকারি-বেসরকারি এবং ব্যক্তি পর্যায়ের দিবাযত্ন কেন্দ্রে দলিত ও হরিজন কর্মজীবী মায়ের সন্তানের অভিগম্যতা নিশ্চিত করা
- দলিত ও হরিজন জনগোষ্ঠীর উপর রাজনৈতিকভাবে জুলুম, হয়রানি বন্ধ করা
- দলিত ও হরিজন জনগোষ্ঠীর ভূমি দখল বন্ধ এবং এ ধরনের অভিযোগ নিষ্পত্তিতে সংশ্লিষ্ট থানা ও প্রশাসনের দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করা
- সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় দলিত নারীর জন্য অনগ্রসর মানউন্নয়ন প্রকল্পভাতা ও বয়স্কভাতা প্রদান করা
- ইউনিয়ন পরিষদ ও সিটি কর্পোরেশনসহ সকল প্রতিষ্ঠানে শ্রম আইন অনুযায়ী সকল সুবিধাসহ নিয়োগ দেয়া
- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে স্থানীয় সরকার ও প্রশাসন কর্তৃক বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা
- নির্বাচনের আগে, নির্বাচনকালে এবং নির্বাচন পরবর্তীতে এই জনগোষ্ঠীর, বিশেষ করে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
- উত্তরাধিকারে এই জনগোষ্ঠীর নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা
- চাকরি ও পড়াশোনার লক্ষ্যে মূলধারার আবাসিক ব্যবস্থায় অভিগম্যতা নিশ্চিত করা
- পরিবার, সমাজ, কর্মক্ষেত্র এবং রাস্তাঘাটে দলিত ও হরিজন নারীর প্রতি বৈষম্য ও সহিংসতা বন্ধ করা।

২০. যৌনকর্মী

প্রেক্ষাপট

বর্তমানে দেশে সুনির্দিষ্ট যৌনপল্লীসহ ভাসমান যৌনকর্মী রয়েছে। ১৯৯০ সালে টানবাজার যৌনপল্লী উচ্ছেদের সূত্র ধরে যৌনকর্মী মূলধারার নারী-আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়। স্থানীয় প্রভাবশালী, রাজনীতিবিদ ও ধর্মীয় নেতারা যৌনকর্মকে অনৈতিক কাজ ঘোষণা করে এবং যৌনপল্লী উচ্ছেদের হুমকি দিতে থাকে। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে ঢাকার বহু পুরাতন কান্দুপট্টি যৌনপল্লী এবং ১৯৯৯ সালে নারায়নগঞ্জের টানবাজার ও নিমতলী যৌনপল্লী উচ্ছেদ করা হয়। এর প্রেক্ষিতে যৌনকর্মীর মানবাধিকার রক্ষার দাবিতে ৮৬টি সংগঠনের সমন্বয়ে "সংহতি" নামে একটি মোর্চা তৈরি হয়।

যৌনকর্ম নিয়ে নারী আন্দোলনের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে, যেমন: অনেকে যৌনকর্মকে পেশা হিসেবে গণ্য করেন আবার অনেকের মতে যৌনকর্ম অগ্রহণযোগ্য, ঝুঁকিপূর্ণ ও সহিংসতাপূর্ণ। ১৯৯৯ সালে হাইকোর্টে দায়েরকৃত রীট মামলায় যৌনকর্মকে পেশা হিসেবে বিবেচনা করার পক্ষে রায় দেন এবং যৌনকর্মীর মানবাধিকার নিশ্চিত করার নির্দেশ দেন।

আমাদের দাবি

- স্বাস্থ্য সেবাসহ সকল ধরনের সেবা নিশ্চিত করা
- সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
- আবাসস্থল থেকে উচ্ছেদ বন্ধ করা
- যৌনকর্মীর নিজ পছন্দ অনুযায়ী পেশা, জীবন-জীবিকার ব্যবস্থা করা
- যৌনকর্মীর সন্তানদের মূলধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা
- মায়ের পরিচয়ে যৌনকর্মীর সন্তানের পরিচয় নিশ্চিত করা।

২১. লিঙ্গ বৈচিত্র্য ও বিভিন্ন যৌন পরিচয়ের জনগোষ্ঠী

প্রেক্ষাপট

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও হিজড়া এবং বিভিন্ন যৌন পরিচয়ের জনগোষ্ঠী রয়েছে।লিঙ্গ বৈচিত্র্য জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে তৃতীয়লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃত তবে তারা জন্ম থেকেই নাগরিক হিসেবে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত।

২০১৩ সালে লিঙ্গ বৈচিত্র্য জনগোষ্ঠীকে তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে স্বীকৃতি দেয়া হলেও লিঙ্গ বৈচিত্র্য বা তৃতীয় লিঙ্গ সম্পর্কে সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দেয়া হয়নি। বাংলাদেশে লিঙ্গ বৈচিত্র্য জনগোষ্ঠীর সংখ্যা এখনও বিতর্কিত। তারা রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় দলবদ্ধভাবে বসবাস করে এবং সাধারণত কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় যুক্ত হতে পারে না। সরকারি স্বীকৃতির কারণে তারা জাতীয় পরিচয়পত্র, ভোটাধিকার, নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার সুযোগ পেলেও পরিবার ও সমাজ তাদের গ্রহণ করে না।

লিঙ্গ বৈচিত্র্য জনগোষ্ঠী নিজ ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী সৎকারের অধিকার থেকেও বঞ্চিত। এছাড়াও দেশে বিভিন্ন যৌনপছন্দভিত্তিক জনগোষ্ঠী রয়েছে কিন্তু সমাজ ও আইন তাদের যৌনপছন্দ অধিকারকে স্বীকৃতি দেয় না যেমন: পুরুষে পুরুষে, নারীতে নারীতে যৌন সম্পর্ক। বাংলাদেশ দন্ডবিধি অনুযায়ী এই বিষয়টি অপ্রাকৃতিক ও দন্ডনীয় অপরাধ। ভারতে এই বিধান বিলুপ্ত হয়েছে। বিভিন্ন দেশের মানবাধিকার ও প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার সাথে বাংলাদেশ সম-অবস্থানে নেই, ফলে এরা অদৃশ্য ও অধিকার বঞ্চিত। বিশ্বের অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে , লিঙ্গ বৈচিত্র্য বা তৃতীয়লিঙ্গের জনগোষ্ঠীর আন্দোলন নারীমুক্তি আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করা হলে অধিক ফলপ্রসূ হয়।

আমাদের দাবি

- কোন শিশু শারিরীকভাবে নারী বা পুরুষ হিসেবে জন্ম না নিলেও বাবা-মা ও নিজ পরিবারের পরিচয়ে পরিচিতি, নাম, উত্তরাধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ তার সকল অধিকার নিশ্চিত করা
- বাবা-মাকে উৎসাহিত করার জন্য স্কুলে ভর্তি ও লেখাপড়ার ক্ষেত্রে বৃত্তিসহ বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা
- প্রাপ্তবয়স্ক লিঙ্গ বৈচিত্র্য জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা
- ব্যক্তির যৌন পরিচিতি ও সম্পর্ক, ব্যক্তিগত পছন্দ এবং অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া

২২. প্রতিবন্ধী নারী

প্রেক্ষাপট

প্রতিবন্ধী নারীর অধিকার নারী-অধিকার আন্দোলনের একটি বিশেষ বিষয়। নাগরিক হিসেবে প্রতিবন্ধী নারীর সম-অধিকার রয়েছে। এরা পরিবারে ও সমাজে অবহেলিত এবং শিশুকাল থেকে নানা অন্যায় ও বৈষম্যের শিকার হয়ে আসছে, ফলে তারা নানা রকম ঝুঁকিতে রয়েছে; বাংলাদেশে, বিশেষ করে গ্রামে ১ কোটি ২০ লক্ষ প্রতিবন্ধী নারী নানা রকম ঝুঁকির মধ্যে জীবন যাপন করছে।

পুরুষের তুলনায় নারীপ্রতিবন্ধী বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার হয় বেশি। এর প্রধান কারণ, বিভিন্ন সেবাখাতে তাদের অভিগম্যতার সীমাবদ্ধতা এবং তাদের জন্য তুলনামূলকভাবে কম সম্পদ বরাদ্দ হওয়া। প্রতিবন্ধী নারী পুরুষের তুলনায় সামাজিক সেবা থেকে বেশী বঞ্চিত হয়। শতকরা মাত্র ২০ ভাগ প্রতিবন্ধী নারী নাগরিক সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে।

এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, শতকরা ৮০ ভাগ প্রতিবন্ধী নারীরই স্বাধীনভাবে জীবন যাপনের সুযোগ নেই। প্রতিবন্ধী নারীও অন্য স্বাভাবিক নারীদের মতোই নানারকম অধিকারহীনতা ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছে এবং সামাজিকভাবে তারা বিচ্ছিন্ন ও অন্যের ওপর নির্ভরশীল, ফলে তাদের অধিকারহীনতার পরিণতি তীব্র ও করুণ। প্রতিবন্ধী নারীদের অধিকার সম্পর্কিত আইন থাকলেও তা বাস্তবায়ন হচ্ছে না বরং বিষয়টিকে এখনও কল্যাণমূলক হিসাবে দেখা হয়।

আমাদের দাবি

- গ্রামীণ, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘু, আদিবাসীসহ সকল প্রতিবন্ধী নারীর স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চাকুরি ও কর্মসংস্থান, ইত্যাদি নিশ্চিত করতে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা
- প্রতিবন্ধী নারীর উপর সহিংসতা বন্ধে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকারসনদ (সিআরপিডি) অনুযায়ী প্রতিবন্ধী নারীর জন্য মানসম্মত, সর্বজনীন নকশায় তৈরি (Accessibility standard and universal design) বাসস্থান এবং যোগাযোগ ব্যবস্থায় অভিগম্যতা নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া এবং পরিবীক্ষণের জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করা
- প্রতিবন্ধী নারীর ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে অভিগম্যতা নিশ্চিত করা
- প্রতিবন্ধী নারীকে উন্নয়নের মূলধারায় যুক্ত করা এবং শিক্ষা ও শিক্ষাউপকরণ, স্বাস্থ্য, চাকুরি, কর্মসংস্থান ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে সম-নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করতে জাতীয় বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা
- প্রতিবন্ধী নারীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসহ মানসম্মত সকল স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা
- রাজনীতিতে প্রতিবন্ধী নারীর অংশগ্রহণ ও ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা, ভোটকেন্দ্র ও ব্যালট পেপার নিশ্চিত করা
- সকল প্রকার তথ্য-উপাত্ত আদান-প্রদান প্রক্রিয়ায় বিশেষভাবে প্রতিবন্ধীদের অন্তর্ভুক্ত করা
- সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং বিনোদনমূলক কর্মকান্ডে প্রতিবন্ধী নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
- প্রতিবন্ধী নারীর জন্য কর্মরত বেসরকারি সংগঠনকে শক্তিশালী করতে সরকারিভাবে উদ্যোগ নেয়া
- 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার এবং নিরাপত্তা আইন ২০১৩'- এর কার্যকর বাস্তবায়ন করা।

২৩. শান্তি ও নিরাপত্তা

প্রেক্ষাপট

বর্তমানে শান্তি ও নিরাপত্তা একটি বৈশ্বিক সমস্যা যা বাংলাদেশেও বিরাজমান। স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশে, বিশেষভাবে পাবর্ত্য অঞ্চলে নানাবিধ দ্বন্দ্ব ও অসহিষ্ণুতা চলছে। ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ পাবর্ত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদন হলেও সার্বিক বিবেচনায় সেনাবাহিনীর উপস্থিতি, বাঙ্গালী-পাহাড়ী দ্বন্দ্ব এবং সশস্ত্র দ্বন্দ্বের কারণে এ অঞ্চল ঝুঁকিপূর্ণ।

সাধারণ নির্বাচনপূর্ব, নির্বাচনকালে ও পরবর্তী সময়ে ধর্ম, ভাষা, মতাদর্শ, জাতি ও গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়, যারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল, সংখ্যায় কম বা প্রান্তিক- তাদের উপর প্রতিনিয়তই ঘটছে নানাবিধ নিপীড়ন-নির্যাতন এবং প্রায়শই তা সহিংস আক্রমণে পরিণত হয়। তাদের উপাসনালয়ে হামলা, ভাঙচুর, বাড়ি-ঘর পোড়ানো, লুটপাট, জায়গা-জমি ও সম্পত্তি জবরদখল, ধর্ষণ ও যৌন আক্রমণ, এমনকি হত্যাকা পর্যন্ত ঘটে। বর্তমানে স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচন- এমনকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রসংসদ নির্বাচনেও সহিংসতার ঘটনা ঘটছে।

ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও দাপট, লোভ, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, পুলিশ ও প্রশাসনের দায়িত্বহীনতা, আইনের শাসনের অবনতি, বিচারহীনতা, ইত্যাদি "শান্তি ও নিরাপত্তা" বিঘ্নিত হওয়ার অন্যতম কারণ।

আমাদের দাবি

- ভিন্নমত, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা নির্বিশেষে সকলের সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠায় "একদেশ এক পরিচয়"-এ উদ্বুদ্ধ করা
- সমাজে অসহিষ্ণুতা নিরসনে কার্যকর উদ্যোগ নেয়া, যেমন: জাতীয়ভাবে 'সম্প্রীতি দিবস' উদযাপন করাসহ নানা কার্যক্রম নেয়া
- সংবিধান ও সংশ্লিষ্ট আইন হালনাগাদ ও সংশোধন করা এবং তা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা
- জনস্বার্থে পার্বত্য শান্তি চুক্তি সংশোধন ও কার্যকর বাস্তবায়ন করা
- সংবিধানে কোন ধর্মকে প্রাধান্য না দেয়া।

ঙ. নারী আন্দোলনের ভূমিকা ও করণীয়

নারী-আন্দোলন বাংলাদেশে শত বছর ধরে নারীমুক্তি ও নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠার লড়াই করে চলেছে। নানামুখী আন্দোলন ও সংগ্রামের ফলে নারীর অবস্থার কিছু পরিবর্তন হলেও অবস্থানের তেমন কোনও পরিবর্তন হয়নি, অতএব নারী-আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী ও বেগবান করার লক্ষ্যে,

- সাংস্কৃতিক কর্মসূচির মাধ্যমে নারীর অবস্থা ও অবস্থান তুলে ধরা
- প্রগতিশীল পরিবর্তনের পক্ষে অবস্থান নেয়া
- নারীকে অধিকার সচেতন ও সংগঠিত করা এবং ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী করা
- প্রান্তিক অবস্থা ও অবস্থানের নারী বা অধিক ঝুঁকিতে যারা রয়েছে তাদের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নেয়া
- নারীর মর্যাদাপূর্ণ জীবন ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা এবং বরাদ্দকৃত ভাতা নিয়মিত প্রদান ও পরিবীক্ষণ করা
- আন্দোলনকে বেগবান, বৈচিত্রপূর্ণ ও শক্তিশালী করার জন্য বিভিন্ন পেশায় ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নারীদের যুক্ত করা
- স্বেচ্ছাসেবী মনোভাব বাড়ানো
- যুবসমাজকে সম্পৃক্ত করা
- আন্দোলনকে আরো বেশী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যুক্ত, সৃজনশীল ও সক্রিয় করা
- বিভিন্ন নারী ও মানবাধিকার সংগঠন, দল ও পেশাজীবীদের সমর্থন পাওয়ার জন্য আন্দোলনের মীমাংসিত আলোচ্য বিষয়সমূহ তাদের সামনে তুলে ধরা।

দাবীনামা তৈরির কর্মশালা ২০১৯

দাবীনামা তৈরির কর্মশালা ২০১৯

নারীপক্ষ

১২-১৩ অক্টোবর ২০১৮

ক্রম	সংগঠনের নাম
১.	অধিকার মহিলা উন্নয়ন সংস্থা
২.	আদর্শ দুস্থ মহিলা উন্নয়ন সংস্থা
৩.	অগ্রযাত্রা
৪.	আকাঙ্খা মহিলা উন্নয়ন সংস্থা
৫.	আমাদের উদ্যোগ
৬.	অনন্যা কল্যাণ সংস্থা
৭.	এএসইডি
৮.	অ্যাডিস সারভাইভারস ফাউন্ডেশন (এএসএফ)
৯.	নজরুল স্মৃতি সংঘ এনএসএস
১০.	বাঁধন মহিলা উন্নয়ন সংস্থা
১১.	বাধুচর শতদল সমাজ কল্যাণ সংস্থা
১২.	বনানী মহিলা উন্নয়ন সংস্থা
১৩.	বানচর আশা
১৪.	বাঁধন সোসাইটি
১৫.	বাংলা একাডেমী
১৬.	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমিতি
১৭.	বাংলাদেশ ইকুয়ালিটি সোসাইটি
১৮.	বাংলাদেশ মহিলা উন্নয়ন সংস্থা
১৯.	বাংলাদেশ প্রেস
২০.	বাপসা
২১.	বাশবাড়ি মহিলা উন্নয়ন সংস্থা
২২.	বিকল্প মহিলা ও শিশু উন্নয়ন সংস্থা
২৩.	বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব লেবার স্টাডিজ

২৪. বিমালি মহিলা সমিতি

২৫. ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন অফ দ্যা রুরাল পুয়োর

২৬. বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ (বিএনপিএস)

২৭. বন্ধন সোসাইটি, কিশোরগঞ্জ

২৮. বনলতা নারী সংঘ

২৯. বাউশী

৩০. বৃত্তের বাইরে মহিলা ও শিশু উন্নয়ন সংস্থা

৩১. চাঁদপুর উন্নয়ন সমিতি

৩২. চাঁদপুর মহিলা উন্নয়ন সমিতি

৩৩. চৈডারবালা মহিলা কল্যাণ সমিতি

৩৪. চরঘরিয়া প্রচেষ্টা মহিলা সংস্থা

৩৫. চুপরিয়া মহিলা সংস্থা

৩৬. পারিবারিক আয় উন্নয়ন সংস্থা

৩৭. কুমিল্লা মহিলা কল্যাণ সংস্থা

৩৮. চিলড্রেন এন্ড ইয়থ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (সাইডো)

৩৯. ডিইএসসি DESC

৪০. ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি

৪১. ঢাকা ট্রিবিউন

৪২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৪৩. ডিস্ক,ঝালকাঠি

৪৪. ডিসট্রিক ওমেন এফেয়ার অফিসার

৪৫. দুর্বার

৪৬. ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন অব দ্যা রুরাল পুয়োর (ড্রপ)

৪৭. দুস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ডিএসকে)

৪৮. একতা মহিলা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা

৪৯. ফিমেল ইনকাম রিসার্চ সেন্টার

৫০. ফ্যামিলি প্ল্যানিং এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (এফপিএবি)

৫১. গলাবাড়ি নারী কল্যাণ সংস্থা

৫২. গণস্বাস্থ্যনগর হাসপাতাল

৫৩. গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র

৫৪. গ্রামবিকাশ সহায়তা সংস্থা

৫৫. হাসনাহেনা মহিলা সমিতি

৫৬. হৃদয় মহিলা উন্নয়ন সংস্থা

৫৭. ইন্সটিটিউট অফ সোশ্যাল এডভান্সমেন্ট

৫৮. জাগো নারী

৫৯. জয়তী সোসাইটি-যশোর

৬০. কাবিদনাগ খাগড়াছড়ি

৬১. করমনির সামাজিক মহিলা উন্নয়ন সংস্থা

৬২. লেডিস ক্লাব-জামালপুর

৬৩. মাহিগঞ্জ চকবাজার মহিলা কল্যাণ সমিতি

৬৪. মানত প্রগতি সংঘ

৬৫. মাতা মহুরি মহিলা সমিতি

৬৬. মেলা সমাজকল্যাণ সংস্থা

৬৭. মিনি নারী কল্যাণ সমিতি

৬৮. মহিলা ও শিশু অধিকার উন্নয়ন সংস্থা

৬৯. মনোশিখা

৭০. মৌচাক মহিলা সমাজকল্যাণ সংস্থা

৭১. মুক্তাগাছা বহুমুখী সমাজ কল্যাণ মহিলা সমিতি

৭২. মিতালি উন্নয়ন সংস্থা

৭৩. নাগরিক উদ্যোগ

৭৪. এনডিপি

৭৫. নীলাম্বর মহিলা সংস্থা

৭৬. প্রাডো

৭৭. পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র

৭৮. প্রাত্যহিক ফাউন্ডেশন

৭৯ রুরাল প্ল্যানিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (আরপিডিও)

৮০ পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র

৮১ পৌর মহিলা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা

৮২ প্রাপ্তি নারী ও শিশু সংস্থা

৮৩ প্রভাতী মহিলা উন্নয়ন সংস্থা

৮৪ প্রচেষ্টা নারী উন্নয়ন মেলা

৮৫ প্রতিভা বিকাশ মহিলা সংস্থা

৮৬ পপুলেশন সার্ভিস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (পিএসটিসি)

৮৭ পূর্ত খাবসাপুর মহিলা উন্নয়ন সংঘ

৮৮ পিডব্লিউডি, সিরাজগঞ্জ

৮৯ রাঙ্গামাটি জেনারেল হাসপাতাল

৯০ আরডিআরএস

৯১ আরএইচস্টেপ (রিপ্রডাকটিভ হেলথ সারভিসেস ট্রেনিং এন্ড এডুকেশন প্রোগ্রাম

৯২

৯৩ রোভার গার্লস গাইড

৯৪ রুরাল প্ল্যানিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন, আরপিডিও

৯৫ রুপায়ন মহিলা উন্নয়ন সংস্থা

৯৬ সাজ যশোর

৯৭ সমতা নারী উন্নয়ন সংস্থা

৯৮ সঞ্চিতা মহিলা উন্নয়ন সংস্থা

৯৯ সংকল্প ট্রাস্ট

১০০ সরকারপাড়া মহিলা সমিতি

১০১ শতাব্দী সমাজ কল্যাণ সংস্থা

১০২ সততা নারী জাগরণী সমিতি

১০৩ এসবিএমকে

১০৪ এসডিএ

১০৫ স্বাধীন মহিলা উন্নয়ন সংস্থা

১০৬ শিশুদের জন্য আমরা

১০৭ এসএনইউএস

১০৮ সৌহাদ্য নারী কল্যাণ ফাউন্ডেশন

১০৯ সাউথ ইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়

১১০ স্পর্শ, ঢাকা

১১১ সৃজন মহিলা সংস্থা

১১২ শ্রম উন্নয়ন সংস্থা

১১৩ সূর্যোদয় মহিলা সমিতি

১১৪ শুভ, বরিশাল

১১৬ তারা মহিলা ও শিশু উন্নয়ন সংস্থা

১১৭ তরঙ্গ মহিলা কল্যাণ সংস্থা

১১৮ দ্যা হাঙ্গার প্রজেক্ট

১১৮ টিএসডিএস রাজশাহী

১১৯ উদ্দিপন মহিলা কল্যাণ সংস্থা

১২০ উন্নয়ন সংস্থা- ইউএস

১২১ উন্নত পরিবার গঠন মহিলা সংস্থা

১২২ উন্নয়ন সংস্থা, জামালপুর

১২৩ উন্নত পরিবার গঠন মহিলা সংস্থা-গাইবান্ধা

১২৪ উন্নয়ন সহায়ক সংস্থা

১২৫ উত্তর সীমারিকান্দি দুস্থ মহিলা কল্যাণ সমিতি

১২৬ ভিসিসিএফ বাংলাদেশ

১২৭ ডব্লিউবিবি ট্রাস্ট

১২৮ ডব্লিউডিএফ

১২৯ ওয়েলফেয়ার ইফোর্টস-ঝিনাইদহ

১৩০ ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম (ডব্লিউএফপি)

১৩১ উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৩২ ইয়ুথ পাওয়ার এন্ড কানেক্টটিভিটি

১৩৩ ওয়াইপিসি

২৩ মার্চ ২০১৯ অনুষ্ঠিত কর্মশালার অংশগ্রহণকারীর তালিকা

ক্রম	সংগঠনের নাম
১	অ্যাসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন
২	আইন ও সালিশ কেন্দ্র
৩	আওয়াজ ফাউন্ডেশন
৪	বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি
৫	বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
৬	বাংলাদেশ আদিবাসী ওমেন নেটওয়ার্ক
৭	ব্লাস্ট
৮	ব্রেকিং দ্যা সাইলেন্স
১০	ফেয়ার ওয়ার্ক ফাউন্ডেশন
১১	হিজড়া সংঘ
১২	ইনোভিশন কাউন্সেলিং লিমিটেড
১৩	কাবিডহ্যাং মধুপুর খাগড়াছড়ি
১৪	কালশী, মিরপুর
১৫	কাপাং ফাউন্ডেশন
১৬	কর্মজীবী নারী
১৭	মুক্তি নারী ও শিশু উন্নয়ন সংস্থা
১৮	নারী অধিকার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ
১৯	নারীপক্ষ
২০	প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
২১	পিডব্লিউডি, সিরাজগঞ্জ
২২	শতাব্দী সমাজ কল্যাণ সংস্থা
২৩	সবুজের অভিযান
২৪	সেক্স ওয়ার্কার নেটওয়ার্ক, ঢাকা
২৫	সচেতন হিজড়া সমাজ সেবা সংস্থা
২৬	সোশ্যাল আপলিফটম্যান ভলেন্টারি অর্গানাইজেশন (শুভো)
২৭	স্পার্ক, রাঙ্গামাটি
২৮	ওয়েলফেয়ার এফোর্টস
২৯	উইমেন উইথ ডিসএবিলিটিস ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন
৩০	ওয়ারবি ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন

১০ এপ্রিল ২০১৯ অনুষ্ঠিত কর্মশালার অংশগ্রহণকারীর তালিকা

ক্রম	সংগঠনের নাম
১	আরন্যক নাট্যদল
২	ঠোঁটকাটা নারীবাদী ব্লগ
৩	যুগান্তর
৪	আত্মনির্ভরশীল
৫	মাছরাঙ্গা টিভি
৬	নাগরিক টিভি